ইউনিট-৯

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা

অধিবেশন-১ : নীতি ও বিধি-বিধান

অধিবেশন-২ : ছুটি বিধি ও অবসর গ্রহণের বিধি-বিধান

অধিবেশন-৩ : ভূমিকা ও দায়িত্ব ঃ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও শিক্ষক অভিভাবক সমিতি

অধিবেশন-৪ : শিক্ষকের আইনগত ও নৈতিক দায়িত্ব ও অধিকার

অধিবেশন-৫ : একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য

ইউনিট -৯ **অধিবেশন-১**

নীতি ও বিধিবিধান

ভূমিকা

যে কোন কার্যক্রম বা উদ্যোগকে বাস্তবায়িত বা সাফল্যমণ্ডিত করতে প্রয়োজন হয় নীতি ও বিধিবিধানের। কোন কর্মকাণ্ড বা কর্মসূচি সুস্পষ্ট নীতি দ্বারা পরিচালিত না হলে তা কখনো লক্ষ্যাভিসারি হয় না বা তা থেকে প্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করা যায় না। একটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যেমন কিছু নীতি ও বিধিবিধানের প্রয়োজন হয় তেমনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্যও প্রয়োজন হয় নীতি ও বিধিবিধানের। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় নীতি ও বিধিবিধানের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার নীতি সাধারণত নির্ধারণ করে থাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর আলোকেই মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত হয়ে থাকে। এ অধিবেশনে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্ষেত্রে নীতি ও বিধিবিধান কী বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত শিক্ষা সম্পর্কিত নীতিমালা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধিবিধান যেমন, নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি, আচরণবিধি ও শৃঙ্খলাবিধি ইত্যাদি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

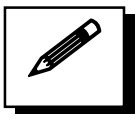

পর্ব-কঃ নীতি ও বিধিবিধান

নীতি (Policy) বলতে আমরা বুঝি গৃহীত সিদ্ধান্ত। শিক্ষা ক্ষেত্রে নীতি হলো এমনকিছু সিদ্ধান্ত যা শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক কার্যাবলি বা অন্যান্য পরিকল্পনা গ্রহণের দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। যেমন: বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এটি একটি গৃহীত নীতি। অপরদিকে বিধিবিধান (Rules and Regulations) হচ্ছে নীতিকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত নিয়মাবলি। শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুষ্ঠুভাবে কর্মসম্পাদনের নিমিত্তে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিধিবিধান রয়েছে। যেমন- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন সংক্রান্ত বিধিবিধান কিংবা শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ বিধিবিধান। এছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালাও গ্রহণ করেছে।

তাহলে আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আমরা নিচের কোনটি নীতি ও কোনটি বিধিবিধানের অন্তর্গত তা পৃথক বৃত্তে সাজানোর চেষ্টা করি-

চাকরির শর্তাবলি	অবৈতনিক নারী শিক্ষা
উপবৃত্তি	ছুটিবিধি
পেনশন নিয়মাবলি	মাতৃভাষায় শিক্ষা
বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন
শৃঙ্খলাবিধি	একমুখী শিক্ষা
সবার জন্য শিক্ষা	প্রশাসনিক পুনর্গঠন
কর্মচারী নিয়োগ	বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্য যাচাই

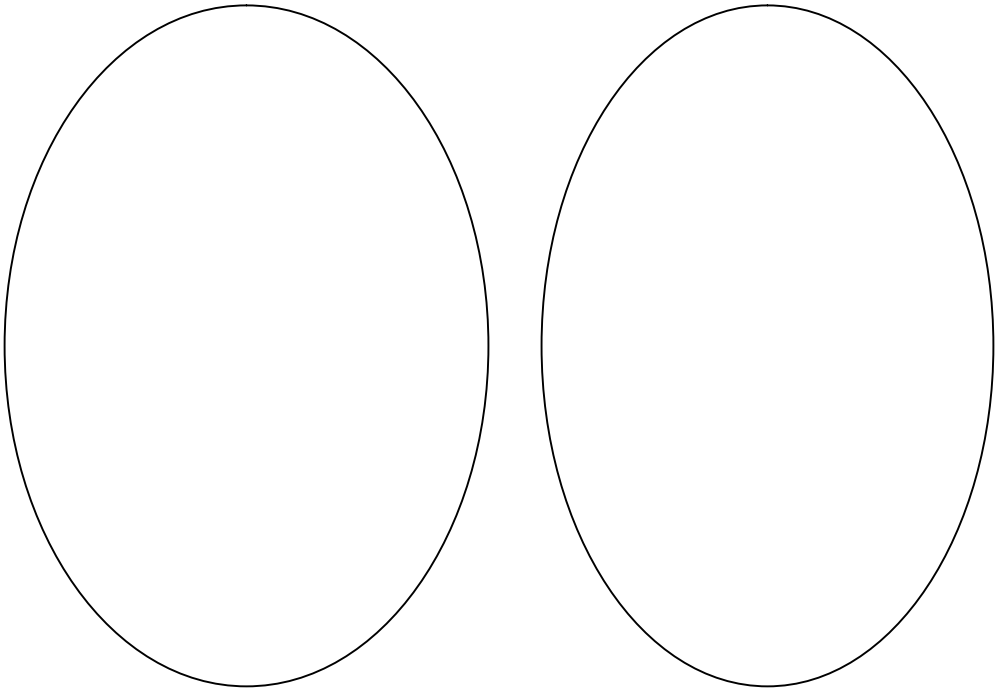

নীতি **বিধিবিধান**

পর্ব-খঃ বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষা সম্পর্কিত নীতিমালা

বাংলাদেশে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতির মৌলিক উৎস হচ্ছে জাতীয় সংবিধান। এছাড়াও শিক্ষামন্ত্রণালয় কখনও কখনও নির্বাহী আদেশ জারী করে নীতি বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়ে থাকে। নীতি নির্ধারণ করা প্রশাসনের কাজ আর বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হলো প্রশাসন কর্তৃক

নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে নীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করা। শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষা সম্পর্কিত নীতিমালার মধ্যে যে বিষয়গুলোর উল্লেখ রয়েছে সেগুলো হল: বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৫ নং অনুচ্ছেদের (ক) অংশে উল্লেখ আছে –

"রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় :

১। (ক) "অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা",

২। ১৭ নং অনুচ্ছেদে আছে –

" রাষ্ট্র –

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক–বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য;

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"

৩। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৮ নং অনুচ্ছেদের (৩) উপধারায় উল্লেখ আছে যে–

"কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না। "

৪। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ৪১ নং অনুচ্ছেদের (৩) উপধারায় উল্লেখ আছে যে – "কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনালয়ে অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।"

শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোন কার্যক্রম বা পরিকল্পনার দিক নির্দেশনা যোগায় সাংবিধানিক অনুবিধি: যেমন শিক্ষা যে একটি মৌলিক অধিকার তা সংবিধানের ২য় ভাগের ১৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে। আবার ১৭ নং অনুচ্ছেদে নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সার্বজনীন শিক্ষার কথা বলা হয়েছে এবং এর জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দিক নির্দেশনা রয়েছে। শুধু শিক্ষাই নয়, জাতীয় পর্যায়ের যে কোন কাজ বা পরিকল্পনার দিক নির্দেশনা সংবিধান থেকে পাওয়া যায় ।

তাহলে আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা এ নীতির আলোকে নিম্নলিখিত বাক্যগুলোর পাশে সত্য বা মিথ্যা নির্ণয়ের মাধ্যমে একমত বা দ্বিমত পোষণ করি:-

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে তার গোষ্ঠী বিবেচ্য বিষয় হবে।

(খ) রাষ্ট্র শিক্ষার কোন দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।

(গ) সরকার গণমুখী শিক্ষার প্রচলন করবে।

(ঘ) নাগরিকের কোনরূপ অক্ষমতা শিক্ষা গ্রহণের বাধা হবে।

(ঙ) শিক্ষা নাগরিকের একটি মৌলিক অধিকার।

পর্ব-গ : বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কযুক্ত চাকরির বিধিবিধান

বিদ্যালয়ের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুষ্ঠুভাবে কর্ম-সম্পাদনের নিমিত্তে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিধি-বিধান রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাগণ পদমর্যাদা ভেদে নীতিমালা প্রণয়ন এবং নির্দেশমালা জারি করেন। জাতীয় সংসদে কোন আইন পাস করা হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় জি ও বা নির্বাহী আদেশ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের বরাবর প্রেরণ করে। মহাপরিচালক উক্ত আদেশ তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জারি করেন। বিদ্যালয় প্রধানগণকে অবশ্যই বিদ্যালয় পরিচালনার আইনসমূহ জানতে হবে এবং আইনের আওতার মধ্যে থেকে বিদ্যালয় পরিচালনার সকল প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে সমস্ত ক্ষেত্রে আদেশ জারি করে সেগুলো হলো –

- শিক্ষা সংক্রান্ত আইন
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন সংক্রান্ত আইন
- শিক্ষা পরিকল্পনা
- শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ, বেতন ভাতা, প্রশিক্ষণ, ছুটি, অবসর গ্রহণ
- শিক্ষাক্রম উন্নয়ন

- বৃত্তি প্রদান
- অর্থ বরাদ্দ
- প্রশাসনিক পুনর্গঠন ইত্যাদি।

একজন সরকারি কর্মচারীর চাকরিবিধির মধ্যে রয়েছে –

(ক) চাকরির শর্তাবলি
(খ) শৃঙ্খলাবিধি
(গ) ছুটিবিধি ও
(ঘ) পেনশন/অবসরগ্রহণ বিধি

তাহলে আসুন বন্ধুরা, এবার আমরা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করি :

(ক) শিক্ষা সংক্রান্ত বিধিবিধান তৃণমূল পর্যায়ে কে জারি করেন?

(খ) অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত আদেশ জারির দায়িত্ব কার?

(গ) জাতীয় সংসদ ও মাউশির মধ্যে সংযোগ কে রক্ষা করে?

ইউনিট -৯ **অধিবেশন-১**

মূল শিখনীয় বিষয়

নীতি ও বিধিবিধান

নীতি (Policy) : শিক্ষাক্ষেত্রে নীতি হলো এমন কিছু সিদ্ধান্ত যা শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক কার্যাবলি বা অন্যান্য পরিকল্পনা গ্রহণের দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। যেমন : বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এটি একটি নীতি। এর জন্য অন্যান্য পরিকল্পনাগুলো হল, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদান ইত্যাদি।

বাংলাদেশে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতির মৌলিক উৎস হচ্ছে জাতীয় সংবিধান। এছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কখনও কখনও নির্বাহী আদেশ জারি করে নীতি বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়ে থাকে। নীতি নির্ধারণ করা প্রশাসনের কাজ আর বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হলো প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে নীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করা। শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষা সম্পর্কিত নীতিমালার মধ্যে যে বিষয়গুলোর উল্লেখ রয়েছে সেগুলো হল: বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৫ নং অনুচ্ছেদের (ক) অংশে উল্লেখ আছে –

“রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় :

১। (ক) “অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা”,

২। ১৭ নং অনুচ্ছেদে আছে –

“ রাষ্ট্র –

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক–বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য ;

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"

৩। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৮ নং অনুচ্ছেদের (৩) উপধারায় উল্লেখ আছে যে –

"কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না। "

৪। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ৪১ নং অনুচ্ছেদের (৩) উপধারায় উল্লেখ আছে যে – "কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনালয়ে অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।"

শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোন কার্যক্রম বা পরিকল্পনার দিক নির্দেশনা যোগায় সাংবিধানিক অনুবিধি: যেমন শিক্ষা যে একটি মৌলিক অধিকার তা সংবিধানের ২য় ভাগের ১৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে । আবার ১৭ নং অনুচ্ছেদে নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সার্বজনীন শিক্ষার কথা বলা হয়েছে এবং এর জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দিক নির্দেশনা রয়েছে । শুধু শিক্ষাই নয় জাতীয় পর্যায়ের যে কোন কাজ বা পরিকল্পনার দিক নির্দেশনা সংবিধান থেকে পাওয়া যায়।

বিদ্যালয়ের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুষ্ঠুভাবে কর্ম-সম্পাদনের নিমিত্তে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিধি-বিধান রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাগণ পদমর্যাদা ভেদে নীতিমালা প্রণয়ন এবং নির্দেশমালা জারী করেন। জাতীয় সংসদে কোন আইন পাস করা হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় জি ও বা নির্বাহী আদেশ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের বরাবর প্রেরণ করে। মহাপরিচালক উক্ত আদেশ তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জারি করেন। বিদ্যালয় প্রধানগণকে অবশ্যই বিদ্যালয় পরিচালনার আইনসমূহ জানতে হবে এবং আইনের আওতার মধ্যে থেকে বিদ্যালয় পরিচালনার সকল প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে সমস্ত ক্ষেত্রে আদেশ জারি করে সেগুলো হলো –

- শিক্ষা সংক্রান্ত আইন
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন সংক্রান্ত আইন
- শিক্ষা পরিকল্পনা
- শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ, বেতন ভাতা, প্রশিক্ষণ, ছুটি, অবসর গ্রহণ
- শিক্ষাক্রম উন্নয়ন
- বৃত্তি প্রদান

- অর্থ বরাদ্দ
- প্রশাসনিক পুনর্গঠন ইত্যাদি।

একজন সরকারি কর্মচারীর চাকরিবিধির মধ্যে রয়েছে –

(ক) চাকরির শর্তাবলি
(খ) শৃঙ্খলাবিধি
(গ) ছুটিবিধি ও
(ঘ) পেনশন/অবসরগ্রহণ বিধি

সরকারি কর্মচারীদের চাকরিবিধি

চাকরিবিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ নং ধারা অনুযায়ী "সরকারি কর্মচারীর অর্থ প্রজাতন্ত্রের কর্মে বেতনাদিযুক্ত পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত কোন ব্যক্তি।"

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩৩ নং ধারা মোতাবেক প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণ করা হবে। তবে এই উদ্দেশ্যে আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণ করে বিধিসমূহ প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে এবং অনুরূপ যে কোন আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে অনুরূপ বিধিসমূহ কার্যকর হবে ।

সরকারি কর্মচারী নিয়োগ ও শর্তাবলি

১। নাগরিকতা : কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে ।

২। বয়সসীমা : চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩০ বছর এবং মুক্তিযোদ্ধা ও উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৩২ বছর।

৩। ডাক্তারি সনদ: স্থায়ীপদে নিয়োগপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীকে সিভিল সার্জন থেকে সুস্থতার ডাক্তারি সনদ প্রদান করতে হবে ।

৪। চাকরির শর্ত :

- সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারী পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্য কোন কাজ করতে পারবেন না ।
- একই স্থায়ীপদে একই সময়ে দুই বা ততোধিক কর্মচারীকে নিয়োগ করা যাবে না।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও দাখিল মাদ্রাসা)-এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান ও জনবল কাঠামো সম্পর্কিত বিধি বিধান: ০১/০১/১৯৮০ তারিখ থেকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য প্রথম বেতন বিধি ও বেতনক্রম চালু হয়। পরবর্তীতে ০১/০১/১৯৮২ তারিখে এবং সর্বশেষ ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখের শাঃ-১১/বিবিধ-৫/৯৪(অংশ-৬)৩৯৪-৩৯৭ পরিপত্রে বেতন বিধি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়, যা বর্তমানে চালু আছে। এ বিধি অনুযায়ী বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিম্নলিখিত শর্তাবলি পূরণ আবশ্যক।

(১) **স্বীকৃতি:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ (নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং দাখিল মাদ্রাসাকে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড) কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত হতে হবে এবং হাল নাগাদ পর্যন্ত স্বীকৃতি নবায়ন থাকতে হবে।

(২) **ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রণীত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি প্রবিধান/নীতিমালা (শিম/শা-১১/বিবিধ-৩৯/৯৬/২৩০ (৬০৬) তারিখ ২৩/৪/১৯৯৭) অনুযায়ী ন্যূনতম সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকতে হবে।

(৩) **শিক্ষাক্রম ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম:** বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রণীত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি প্রবিধান/নীতিমালা (শিম/শা-১১/বিবিধ-৩৯/৯৬/২৩০(৬০৬) তারিখ: ২৩/৪/১৯৯৭) এর বর্ণনা মোতাবেক ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম চালু থাকতে হবে।

(৪) **হিসাবরক্ষণ ও আয়-ব্যয় নিরীক্ষা:** বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রণীত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি "নির্দেশিকা" (শিম/শা-৪/১০/এম-৫০/৮৩/৫৬০ (১৫০০০) শিক্ষা, তারিখ ১০/৬/১৯৮৪) অনুযায়ী হিসাব সংরক্ষণ ও আয়-ব্যয় নিরীক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকতে হবে।

(৫) **ব্যবস্থাপনা কমিটি:** বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের ব্যবস্থাপনা কমিটি সম্পর্কিত প্রবিধিমালা অনুযায়ী (মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের "ম্যানেজিং কমিটি রেগুলেশন ৭৭, দাখিল মাদ্রাসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের "গভর্নিং বডি এবং ম্যানেজিং কমিটি

রেগুলেশন ৭৯", নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে উপ-পরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বিধান অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকতে হবে এবং সময়ে সময়ে সরকার প্রদত্ত সকল নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই পালন করতে হবে।

(৬) পরীক্ষার ফলাফলঃ

(ক) বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও দাখিল মাদ্রাসাকে নিম্নলিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, বোর্ডের আওতাধীন পাবলিক পরীক্ষায় ও প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পরীক্ষায় ন্যূনতম ফলাফল অর্জন করতে হবে।

(খ) কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তির পর ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত পাবলিক পরীক্ষায় বোর্ডের বার্ষিক পাশের হারের ৫০% ফলাফল অর্জন এবং তৎপরবর্তীতে তা সংরক্ষণ করতে হবে।

সরকারি কর্মচারীর /কর্মকর্তার আচরণবিধি (১৯৭৯)

আচরণবিধি

(ক) সরকারি কর্মচারী বা তার পরিবারের সদস্য অফিসের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির থেকে দান বা উপহার গ্রহণ করতে পারবেন না ।

(খ) রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কোন বিদেশী পদবি, পুরস্কার গ্রহণ করতে পারবেন না ।

(গ) সরকারি চাকরিতে যোগদানের সময় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব দিতে হবে ।

(ঘ) সরকারের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে স্থাবর–অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় করা বা বাড়িঘর নির্মাণ করা যাবে না ।

(ঙ) সরকারের সমালোচনা করা যাবে না এবং সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে বইপুস্তক প্রকাশ করা যাবে।

(চ) রাজনীতিতে বা সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না ।

(ছ) কর্মস্থলের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির নিকট হতে কোন ধার নিতে বা দিতে পারবেন না ।

উপরিউক্ত আচরণ বিধিমালা (১৯৭৯) এর বরখেলাপ হলে ১৯৮৫ সালের শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ বলে বিবেচিত হবে এবং উক্ত আইনে তদন্তসাপেক্ষে তা শাস্তিযোগ্য হবে। দুই ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে । যথা– লঘু দণ্ড ও গুরু দণ্ড।

লঘু শাস্তির মধ্যে রয়েছে –

১। তিরস্কার করা বা নিন্দাজ্ঞাপন

২। পদোন্নতি কিংবা বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা ইত্যাদি ।

গুরুদণ্ডের মধ্যে রয়েছে –

১। নিম্নপদে বা টাইমস্কেলে নামিয়ে দেওয়া, চাকরি হতে অপসারণ/বরখাস্ত করা ইত্যাদি ।

২। বাধ্যতামূলক অবসরদান।

৩। চাকরি হতে অপসারণ/ বরখাস্ত করা ইত্যাদি।

কোন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা চলাকালে বিভাগীয় মামলাও হতে পারে তবে কর্মচারী তার শাস্তির বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের সমীপে আপিল করতে পারেন। মামলা চলাকালে অভিযুক্ত ব্যক্তি বেতন ভাতা পাবেন কিনা তা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে ।

৫। **ছুটি বিধি :** সরকারি কর্মচারী বিভিন্ন ধরনের ছুটি ভোগ করতে পারেন। তবে অস্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক ব্যক্তি কোন কোন ছুটি ভোগ করতে পারেন না।

৬। **পেনশন ও গ্র্যাচুয়িটি :** একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত সরকারি চাকরিতে অবস্থানের পর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ কিংবা মৃত্যুবরণ করলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী অবসরকালীন সময়ের অথবা তার মৃত্যুতে তার পরিবার মাসিক যে আর্থিক সুবিধা পায় তাকে পেনশন বলে। অবসর গ্রহণকালীন সময়ে এককালীন যে টাকা পায় তা হচ্ছে গ্র্যাচুয়িটি ।

শৃঙ্খলাবিধি

বাংলাদেশে সুশৃঙ্খলভাবে কর্ম-সম্পাদনের জন্য 'সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি ১৯৮৫' জারী করা হয়।

বিধি – ১ : শিরোনাম ও যাদের বেলায় প্রযোজ্য

নিম্নলিখিত কর্মচারী ব্যতীত বিধিমালা সকল কর্মচারীর উপর প্রযোজ্য

(ক) রেলওয়ে কর্মচারী, (খ) মেট্রোপলিটন পুলিশের অধঃস্তন কর্মচারী (গ) পুলিশ পরিদর্শনের নিম্নপদস্থ পুলিশ বিভাগের কর্মচারী, (ঘ) বাংলাদেশ রাইফেলসের অধঃস্তন কর্মকর্তা, রাইফেলম্যান এবং সিগন্যালম্যান, (ঙ) বাংলাদেশ কারা জেইলারের নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা।

সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের যে কোন শ্রেণির কর্মচারীকে সরকার উক্ত বিধির আওতাভুক্ত করতে পারবেন ।

বিধি – ২ : সংজ্ঞা

২নং বিধিতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শব্দসমূহের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। যেমন : সরকারি কর্মচারী বলতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বোঝায়।

এ বিধির ২.৬ এ অসদাচরণ হচ্ছে –

- উপরস্থ কর্মকর্তার আদেশ অমান্য করা।
- কর্তব্যের চরম অবহেলা।
- আইনসংগত কোন কারণ ছাড়া সরকারের কোন আদেশ, সার্কুলার এবং নির্দেশাবলিকে বিদ্রূপ করা।
- কোন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন কর্তৃপক্ষের নিকট বিরক্তিকর, মিথ্যা বা তুচ্ছ অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত পেশ করা।
- বাংলা ভাষায় কাজ না করা।

বিধি–৩ : শাস্তি

এ বিধিতে শাস্তির কারণগুলোর উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ করে বিধি ৩.৫ এ রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কাজ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে উল্লেখ রয়েছে ।

বিধি – ৪ : শাস্তিসমূহ

এখানে শাস্তির ধরন যথা – লঘু দণ্ড ও গুরুদণ্ডের উল্লেখ রয়েছে। শাস্তিসমূহের মধ্যে কোনগুলো লঘু ও কোনগুলোর জন্য গুরুদণ্ড দেওয়া হবে তার উল্লেখ আছে।

বিধি– ৫:

এ বিধিতে রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কার্যে নিয়োজিত অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

বিধি-৬:

লঘু শাস্তির জন্য তদন্ত পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে।

বিধি-৭:

গুরুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে তদন্ত প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ আছে।

এছাড়াও আরও অনেক বিধি ও উপবিধি রয়েছে। যেমন- আপীল সংক্রান্ত, এর সময়সীমা, আপীল দাখিলের পদ্ধতি, আপীল পাঠানোর তারিখ, আপীল নিষ্পত্তি পদ্ধতি ইত্যাদি। এছাড়াও পুনর্বিবেচনা ও সংশোধন সম্পর্কিত বিধি ও উপবিধিও রয়েছে। রাষ্ট্রপতির নিকট আপীল করার বিষয়ও এ অংশে উল্লেখ আছে ।

মূল্যায়ন

১. নীতি ও বিধি-বিধান কী? নীতি ও বিধি-বিধানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।

২. শিক্ষা সংক্রান্ত নীতির উৎস কী? বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত শিক্ষা সংক্রান্ত ধারাসমূহ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

৩. সরকারি কর্মচারী নিয়োগের শর্তাবলি বর্ণনা করুন।

৪. সরকারি কর্মচারীর শাস্তি বিধি আলোচনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ক

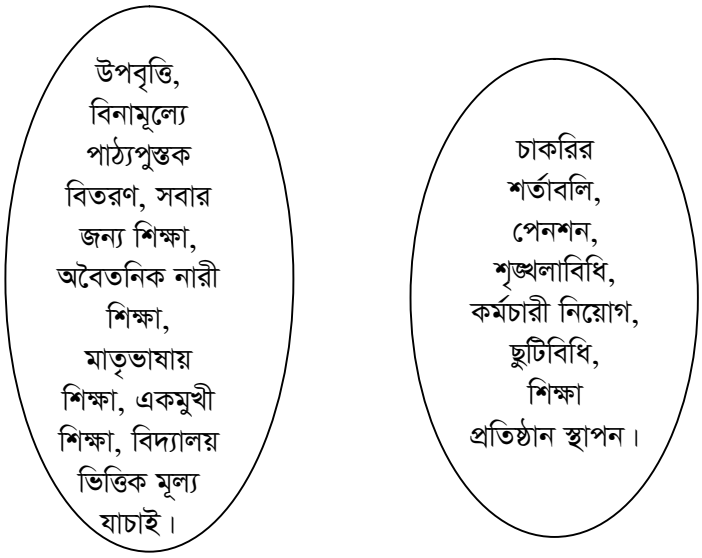

পর্ব-খ

(ক) মিথ্যা, (খ) মিথ্যা, (গ) সত্য, (ঘ) মিথ্যা, (ঙ) সত্য

পর্ব-গ

(ক) মহাপরিচালক, মাউশি

(খ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

(গ) মাউশি

ইউনিট -৯ **অধিবেশন-২**

ছুটি বিধি ও অবসর গ্রহণের বিধি-বিধান

মানুষ আদিকাল থেকে কর্মের মাধ্যমে তার জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করেছে। গুহাবাসী মানুষ সারাদিনের শিকার শেষে সন্ধ্যায় গুহায় বিশ্রাম নিয়েছে। এমনি করে চলেছে দিন সপ্তাহ মাস এমনকি বৎসর। এ অর্থে তাদের জীবনে ছুটি বলতে কিছু ছিল না। পরবর্তী সময়ে ধর্মের সৃষ্টি হলে তাতে ছুটির ধারণাও তৈরি হয়েছে। আমরা যেমন বাইবেলে দেখতে পাই ঈশ্বর ছয়দিন ধরে সৃষ্টিকর্ম করে রবিবার বিশ্রাম নিলেন। জীবিকা যখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছেন তখন তাতে কর্ম সময় ও বিশ্রামের সময় নির্ধারিত হয়েছে। এ সময়সমূহকে প্রাতিষ্ঠানিক বিধিবিধানে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ অধিবেশনে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক ছুটি ও অবসরের বিধিবিধান সম্পর্কে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি–

- বিদ্যালয় শিক্ষকদের ছুটিবিধির প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিদ্যালয় শিক্ষকদের ছুটির নিয়মকানুন বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিদ্যালয় শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বিধিবিধান বলতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : ছুটিবিধি ও প্রকারভেদ

ছুটি বলতে আমরা বুঝি বিশ্রাম বা অবসর। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে ছুটি বলতে আমরা বুঝবো কোন কার্যদিবসে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কর্মচারীর অনুমোদিত অনুপস্থিতি। সংজ্ঞা আকারে বলা যায়, "কোন কার্যদিবসে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কর্মচারীর অনুমোদিত অনুপস্থিতির কালকে ছুটি বলা হয়"। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটির কিছু পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ছুটির চাইতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিছু বাড়তি ছুটি পেয়ে থাকে। এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান Vacation Department-এর অন্তর্ভুক্ত। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কোন ছুটির হিসাব ভিন্নভাবে করা হয়ে থাকে। ছুটির হিসাব হয় জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। সরকার বছর শুরুর পূর্বেই প্রতিষ্ঠানের ছুটি নির্ধারণ করে থাকে। ছুটি অনেক প্রকারের হয়ে থাকে। যথা-

১। সাধারণ ছুটি (Public Holiday)
২। নৈমিত্তিক ছুটি (Casual Leave)
৩। অর্জিত ছুটি (Earn Leave)
৪। প্রসূতি ছুটি (Maternity Leave)
৫। চিকিৎসা ছুটি (Medical Leave)
৬। অধ্যয়ন ছুটি (Study Leave)
৭। শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি (Rest and Recreation Leave)
৮। অসাধারণ ছুটি (Extraordinary Leave)
৯। সঙ্গ নিরোধ ছুটি (Quarantine Leave)
১০। কর্তব্যরত ছুটি (Duty Leave)
১১। অক্ষমতাজনিত বিশেষ ছুটি (Special Disability Leave)
১২। অবসর প্রস্তুতি ছুটি (Leave Preparatory to Retirement)

এসব ছুটি প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানেই প্রচলিত। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর বাইরেও কিছু ছুটি ভোগ করে থাকে। তাহলে আসুন বন্ধুরা আমরা এরকম দুটি ছুটির নাম নিচের ছকে লিখি —

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ধরনের ছুটি-
ক.
খ.

পর্ব-খ : ছুটির নিয়ম কানুন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান Vacation department-এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানে গ্রীষ্মকালীন ছুটি, শীতকালীন ছুটি, পূজা ও রোজার ছুটি ইত্যাদি ব্যবস্থা আছে। তাই এসব প্রতিষ্ঠানে কোন কোন ছুটির হিসাব ভিন্নভাবে করা হয়ে থাকে। ছুটির হিসাব হয় জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। সরকার বছর শুরুর পূর্বেই প্রতিষ্ঠানের ছুটি নির্ধারণ করে থাকে।

ছুটির প্রকারভেদ

১। **সাধারণ ছুটি (Public Holiday) :** বাংলাদেশে বর্তমানে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সাপ্তাহিক ছুটি হচ্ছে শুক্রবার ও শনিবার । তবে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের প্রয়োজনমত শনিবার খোলা রাখতে পারে। জাতীয় দিবস যেমন – বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ঈদের ছুটি এগুলো সরকার কর্তৃক নির্ধারিত। শব-ই-বরাত, আশুরা, শব-ই-মেরাজ, শ্রীপঞ্চমী বা মাঘী পূর্ণিমার ছুটি এগুলো ঐচ্ছিক ছুটি। মুসলমান, হিন্দু , বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর কর্মচারীগণ নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী বৎসরে ৩ দিন কর্তৃপক্ষের অনুমতিসাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ঐচ্ছিক ছুটি ভোগ করতে পারেন। তবে এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কখনও কখনও শব-ই-বরাত, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার আগের ও পরের দিন সরকার নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে ছুটি দিয়ে থাকে।

২। **নৈমিত্তিক ছুটি (Casual leave) :** নৈমিত্তিক কারণে যে ছুটি পাওয়া যায় তাকে নৈমিত্তিক ছুটি বলে। এখানে নৈমিত্তিক বলতে ছোট খাট অসুস্থতা, স্বল্প সময়ের জন্য ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ইত্যাদির প্রয়োজন বুঝায়। গুরুতর অসুস্থতা অথবা দীর্ঘদিনের প্রয়োজন নৈমিত্তিক হিসেবে গণ্য নয়। সৌর বছরে নৈমিত্তিক ছুটি ২০ দিন। প্রয়োজনে এক সঙ্গে ১০ দিন পর্যন্ত মঞ্জুরযোগ্য। এই ছুটির সঙ্গে যে কোন একদিকে সরকারি/সাপ্তাহিক ছুটি সংযুক্ত করা যায়। নৈমিত্তিক ছুটি নিয়ে বিদেশ গমন করা যাবে না। নৈমিত্তিক ছুটি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি আবশ্যক। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষককে পরিচালনা পরিষদের অনুমোদনক্রমে অসুস্থতা বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

ক) একজন শিক্ষককে এক পঞ্জিকা বর্ষে সর্বাধিক ২০ (বিশ) দিন (সরকারি নির্দেশ মোতাবেক এই দিনের সংখ্যা পরিবর্তিত হতে পারে) নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

খ) নৈমিত্তিক ছুটিজনিত অনুপস্থিতিকে কাজে অনুপস্থিত হিসাবে গণ্য করা হয় না এবং কর্তব্যে কর্মরত হিসাবে বিবেচনা করা হয় বিধায় কোন শিক্ষকের নৈমিত্তিক ছুটি ভোগের কারণে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার আশংকা থাকলে নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করা যাবে না।

গ) কোন শিক্ষককে এক সঙ্গে ১০ (দশ) দিনের বেশি নৈমিত্তিক ছুটি দেয়া যাবে না।

ঘ) কোন শিক্ষক আবেদন জানালে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি, এক বা একাধিকবার কোন সাপ্তাহিক ছুটি বা সরকারি ছুটি বা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত তালিকাভুক্ত অন্যান্য ছুটির পূর্বে অথবা পর সংযুক্তির অনুমতি দেয়া যাবে।

ঙ) নৈমিত্তিক ছুটির উভয় দিকে অন্য কোন প্রকার ছুটি সংযুক্ত করা যাবে না।

চ) কর্তৃপক্ষ বা পরিচালনা পরিষদ এর পূর্বানুমতি ছাড়া নৈমিত্তিক ছুটি ভোগকারী কোন শিক্ষক নিজ কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবেন না।

ছ) নৈমিত্তিক ছুটিতে থাকাকালে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি দেয়া যাবে না এবং দেশের ভিতরে নিজ কর্মস্থল থেকে এমন দূরত্বে যাওয়ার অনুমতি দেয়া যাবে না যেখান হতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কর্মস্থলে পৌঁছতে স্বাভাবিকভাবে ৪৮ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে।

৩। **অর্জিত ছুটি (Earn leave) :** একজন স্থায়ী সরকারি কর্মচারী প্রতি ১১ দিনে ১ দিন এবং অস্থায়ী কর্মচারী তিন বছর পূর্ণ হওয়ার পর পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি পাওয়ার যোগ্য। আবার একজন স্থায়ী কর্মচারী প্রতি ১২ দিনে একদিন ও একজন অস্থায়ী কর্মচারী প্রতি ৩০ দিনে ১ দিন হিসেবে অর্ধগড় বেতনে ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

৪। **প্রসূতিছুটি (Meternity leave) :** একজন মহিলা কর্মচারী কতিপয় শর্তে চার মাস প্রসূতি ছুটি প্রাপ্য। চাকরিকালীন সময়ে একজন মহিলা সর্বমোট ২ বার বেতন ভাতা সহ এই ছুটি ভোগ করতে পারেন । অস্থায়ী কর্মচারীর চাকরিকাল ৯ মাস হলে এ ছুটি পাওয়া যায় ।

৫। **চিকিৎসা ছুটি (Medical leave) :** কর্তব্য পালন কালে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে এ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে এ ছুটি প্রদানযোগ্য ।

৬। **অধ্যয়ন ছুটি (Study leave):** পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য এ ছুটি মঞ্জুর করা যাবে। সাধারণত চাকরির মেয়াদ ৫ বছর পূর্ণ না হলে অথবা যাদের ৩ বছরের কম চাকরি আছে তাদেরকে এ ছুটি দেওয়া হয় না ।

৭। **শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি (Rest and Recreation leave) :** সরকারি কর্মচারীগণ প্রতি তিন বছর অন্তর ১৫ দিন এ ছুটি ভোগ করতে পারেন। তবে এ ছুটি ভোগ করতে হলে চাকরিকাল তিনবছর হতে হবে এবং গড় বেতনে ১৫ দিনের ছুটি পাওনা থাকতে হবে। এ ছুটিকালীন সময়ে ছুটি ভোগকারী কর্মচারী ছুটিকালীন বেতন ছাড়াও অতিরিক্ত এক মাসের মূল বেতনের সমান বিনোদন ভাতা পেয়ে থাকেন ।

৮। **অসাধারণ ছুটি (Extraordinary Leave):** বিধি মোতাবেক অন্য কোন ছুটি পাওনা না থাকলে বিনা বেতনের ছুটিকে অসাধারণ ছুটি বলে ।

৯। **সঙ্গনিরোধ ছুটি (Quarantive Leave):** পরিবারের কোন সদস্য কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে ২১ থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত এ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। এ ছুটি কর্মকালীন বলে গণ্য হয়।

১০। **কর্তব্যরত ছুটি (Duty Leave):** নিম্নোক্ত বিষয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষককে কর্তব্যরত ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

ক) পরীক্ষা চালনা।

খ) সরকারি পরিচালনা পরিষদ, শিক্ষা বো্র্ড, বিশ্ববিদ্যালয় বা যে কোন আইন সঙ্গত সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সম্ভাব্য সেমিনারে যোগদান।

গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাপ্ত আদালতের আদেশ বলে আদালতে জুরী বা রাজসাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হওয়া।

ঘ) পারিশ্রমিক ছাড়া সরকার বা সরকারি সংস্থা বা শিক্ষা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত কোন কমিটির সভায় সদস্য হিসাবে যোগদান।

ঙ) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বা শিক্ষা বোর্ডের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বা সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে আইনসঙ্গত কোন সংস্থা বা সমিতিতে যোগদান।

অক্ষমতাজনিত বিশেষ ছুটি (Special Disability Leave): কোন সরকারি কর্মচারী অনভিপ্রেত কোন আঘাতের দ্বারা বা কারণে, অথবা স্বীয় দায়িত্ব সূচারুরূপে পালন করতে যেয়ে আহত হয়ে অক্ষম হলে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

ঘটনা সংগঠনের ৩ মাসের মধ্যে অক্ষমতা প্রকাশ না পাইলে এবং অক্ষম ব্যক্তি যথাযথ তৎপরতার সহিত ইহা কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত না করলে এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা যাবে না। তবে সরকার অক্ষমতার কারণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে, ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ৩ মাসের অধিক সময় পরেও অক্ষমতা প্রকাশ পেলে এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

বাধ্যতামূলক ছুটি

প্রকৃতপক্ষে বাধ্যতামূলক ছুটি নামে কোন ছুটি নাই। তবে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি-৫ (১) (এ) এর অধীনে বাধ্যতামূলক কার্যক্রমের অভিযোগে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে এবং বিধি-১১(১) এর অধীনে অসদাচরণ, ডিজারসন ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সাময়িক বরখাস্তের পরিবর্তে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে প্রাপ্যতা অনুযায়ী ছুটিতে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে উক্ত কর্মচারীদের ছুটি ভোগ বাধ্যতামূলক। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি-৩(২) তে বর্ণিত নাশকতামূলক কার্যের অভিযোগে কার্যক্রম

গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উক্ত বিধিমালার বিধি-৫(১) (১) এর অধীনে প্রাপ্ত ছুটির ভিত্তিতে আদেশে উল্লেখিত তারিখ হতে ছুটিতে যাবার লিখিত নির্দেশ দিতে পারেন।

১১। অবসর প্রস্তুতি ছুটি (Leave Preparatory to retirement-LPR): একজন সরকারি কর্মকর্তা ৫৮ বছর বয়স পর্যন্ত এ ছুটি ভোগ করতে পারেন। এ সময়ে ২ বছর ছুটি পাওনা থাকলে এক বছরের জন্য আগাম বেতন পান। বাকি এক বছরের মধ্যে ৬ মাস পূর্ণ গড় বেতনে এবং ৬ মাস অর্ধগড় বেতনে ছুটি পান। এল.পি.আর এ থাকা অবস্থায় বহি:বাংলাদেশ ছুটি প্রাপ্য।

তাহলে বন্ধুরা, উপরের ছুটিসমূহের কোন কোন ছুটির জন্য আপনার ডাক্তারি সনদপত্রের প্রয়োজন আছে তা চিহ্নিত করুন।

ডাক্তারি সনদপত্র লাগবে এ ধরনের ছুটি-
ক.
খ.
গ.
ঘ.

পর্ব-গ : অবসর গ্রহণের বিধি-বিধান

কোন সরকারি কর্মকর্তা / কর্মচারী চাকুরির নির্দিষ্ট মেয়াদ অর্থাৎ তার বয়স ৫৭ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর অবসর কালীন সময়ে যে ভাতা পান তাকে অবসর ভাতা বা পেনশন বলে। অবশ্য কর্মচারীর বয়স ৫৭ হওয়ার শর্ত পূরণ না করেও অবসর ভাতা পাওয়া যেতে পারে। এ রকম তিন ধরনের অবসর ভাতা রয়েছে। যথা- (১) ক্ষতিপূরণমূলক অবসর ভাতা, (২) অক্ষমতাজনিত অবসর ভাতা এবং (৩) ঐচ্ছিক অবসরভাতা।

কতজন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী অবসর নেয়ার সময় অন্যান্য তহবিল হতেও সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। তহবিলগুলো হচ্ছে - (ক) ভবিষ্যৎ তহবিল, (খ) গ্রাচুইটি, (গ) যৌথবীমা। অবসর গ্রহণের বিধিবিধান ও বিভিন্ন তহবিল সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আমরা মূল শিখনীয় বিষয়বস্তুতে লিপিবদ্ধ করেছি। আসুন আমরা তা মনোযোগ দিয়ে পড়ি এবং বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের পরও চাকুরি করার বিধানের ধারাগুলো লিপিবদ্ধ করি।

ক. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের বয়স ..... বৎসর হলে অবসর গ্রহণ করবেন।

খ. তিনি মোট ..... বৎসর তার চাকুরিকাল বর্ধিত করতে পারবেন।

গ. ..... বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার চাকুরিকাল কোন অবস্থাতেই বর্ধিত করা হবে না।

ইউনিট-৯ **অধিবেশন-২**

মূল শিখনীয় বিষয়

ছুটি বিধি ও অবসর গ্রহণের বিধিবিধান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান Vacation department-এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানে গ্রীষ্মকালীন ছুটি, শীতকালীন ছুটি, পূজা ও রোজার ছুটি ইত্যাদি ব্যবস্থা আছে। তাই এসব প্রতিষ্ঠানে কোন কোন ছুটির হিসাব ভিন্নভাবে করা হয়ে থাকে। ছুটির হিসাব হয় জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। সরকার বছর শুরুর পূর্বেই প্রতিষ্ঠানের ছুটি নির্ধারণ করে থাকে।

ছুটির প্রকারভেদ

ছুটির প্রকারভেদ

১। **সাধারণ ছুটি (Public Holiday) :** বাংলাদেশে বর্তমানে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সাপ্তাহিক ছুটি হচ্ছে শুক্রবার ও শনিবার । তবে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের প্রয়োজনমত শনিবার খোলা রাখতে পারে। জাতীয় দিবস যেমন – বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ঈদের ছুটি এগুলো সরকার কর্তৃক নির্ধারিত। শব-ই-বরাত, আশুরা , শব-ই-মেরাজ, শ্রীপঞ্চমী বা মাঘী পূর্ণিমার ছুটি এগুলো ঐচ্ছিক ছুটি। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর কর্মচারীগণ নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী বৎসরে ৩ দিন কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ঐচ্ছিক ছুটি ভোগ করতে পারেন। তবে এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কখনও কখনও শব-ই-বরাত, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার আগের ও পরের দিন সরকার নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে ছুটি দিয়ে থাকে।

২। **নৈমিত্তিক ছুটি (Casual leave) :** নৈমিত্তিক কারণে যে ছুটি পাওয়া যায় তাকে নৈমিত্তিক ছুটি বলে। এখানে নৈমিত্তিক বলতে ছোট খাট অসুস্থতা, স্বল্প সময়ের জন্য ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ইত্যাদির প্রয়োজন বুঝায়। গুরুতর অসুস্থতা অথবা দীর্ঘদিনের প্রয়োজন নৈমিত্তিক হিসেবে গণ্য নয়। সৌর বছরে নৈমিত্তিক ছুটি ২০ দিন। প্রয়োজনে এক সঙ্গে ১০ দিন পর্যন্ত মঞ্জুরযোগ্য। এই ছুটির সঙ্গে যে কোন একদিকে সরকারি/সাপ্তাহিক ছুটি সংযুক্ত করা যায়। নৈমিত্তিক ছুটি নিয়ে বিদেশ গমন করা যাবে না। নৈমিত্তিক ছুটি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি আবশ্যক। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষককে পরিচালনা পরিষদের অনুমোদনক্রমে অসুস্থতা বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

জ) একজন শিক্ষককে এক পঞ্জিকা বর্ষে সর্বাধিক ২০ (বিশ) দিন (সরকারি নির্দেশ মোতাবেক এই দিনের সংখ্যা পরিবর্তিত হতে পারে) নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

ঝ) নৈমিত্তিক ছুটিজনিত অনুপস্থিতিকে কাজে অনুপস্থিত হিসাবে গণ্য করা হয় না এবং কর্তব্যে কর্মরত হিসাবে বিবেচনা করা হয় বিধায় কোন শিক্ষকের নৈমিত্তিক ছুটি ভোগের কারণে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার আশংকা থাকলে নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করা যাবে না।

ঞ) কোন শিক্ষককে এক সঙ্গে ১০ (দশ) দিনের বেশি নৈমিত্তিক ছুটি দেয়া যাবে না।

ট) কোন শিক্ষক আবেদন জানালে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি, এক বা একাধিকবার কোন সাপ্তাহিক ছুটি বা সরকারি ছুটি বা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত তালিকাভুক্ত অন্যান্য ছুটির পূর্বে অথবা পর সংযুক্তির অনুমতি দেয়া যাবে।

ঠ) নৈমিত্তিক ছুটির উভয় দিকে অন্য কোন প্রকার ছুটি সংযুক্ত করা যাবে না।

ড) কর্তৃপক্ষ বা পরিচালনা পরিষদ এর পূর্বানুমতি ছাড়া নৈমিত্তিক ছুটি ভোগকারী কোন শিক্ষক নিজ কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবেন না।

ঢ) নৈমিত্তিক ছুটিতে থাকাকালে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি দেয়া যাবে না এবং দেশের ভিতরে নিজ কর্মস্থল থেকে এমন দূরত্বে যাওয়ার অনুমতি দেয়া যাবে না যেখান হতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কর্মস্থলে পৌঁছতে স্বাভাবিকভাবে ৪৮ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে।

৩। **অর্জিত ছুটি (Earn leave) :** একজন স্থায়ী সরকারি কর্মচারী প্রতি ১১ দিনে ১ দিন এবং অস্থায়ী কর্মচারী তিন বছর পূর্ণ হওয়ার পর পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি পাওয়ার যোগ্য। আবার একজন স্থায়ী কর্মচারী প্রতি ১২ দিনে একদিন ও একজন অস্থায়ী কর্মচারী প্রতি ৩০ দিনে ১ দিন হিসেবে অর্ধগড় বেতনে ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

৪। **প্রসূতিছুটি (Meternity leave) :** একজন মহিলা কর্মচারী কতিপয় শর্তে চার মাস প্রসূতি ছুটি প্রাপ্য। চাকরিকালীন সময়ে একজন মহিলা সর্বমোট ২ বার বেতন ভাতা সহ এই ছুটি ভোগ করতে পারেন । অস্থায়ী কর্মচারীর চাকরিকাল ৯ মাস হলে এ ছুটি পাওয়া যায় ।

৫। **চিকিৎসা ছুটি (Medical leave) :** কর্তব্য পালন কালে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে এ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে এ ছুটি প্রদানযোগ্য।

৬। **অধ্যয়ন ছুটি (Study leave):** পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য এ ছুটি মঞ্জুর করা যাবে। সাধারণত চাকরির মেয়াদ ৫ বছর পূর্ণ না হলে অথবা যাদের ৩ বছরের কম চাকরি আছে তাদেরকে এ ছুটি দেওয়া হয় না ।

৭। **শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি (Rest and Recreation leave) :** সরকারি কর্মচারীগণ প্রতি তিন বছর অন্তর ১৫ দিন এ ছুটি ভোগ করতে পারেন। তবে এ ছুটি ভোগ করতে হলে চাকরিকাল তিনবছর হতে হবে এবং গড় বেতনে ১৫ দিনের ছুটি পাওনা থাকতে হবে। এ ছুটিকালীন সময়ে ছুটি ভোগকারী কর্মচারী ছুটিকালীন বেতন ছাড়াও অতিরিক্ত এক মাসের মূল বেতনের সমান বিনোদন ভাতা পেয়ে থাকেন ।

৮। **অসাধারণ ছুটি (Extraordinary Leave):** বিধি মোতাবেক অন্য কোন ছুটি পাওনা না থাকলে বিনা বেতনের ছুটিকে অসাধারণ ছুটি বলে ।

৯। **সঙ্গনিরোধ ছুটি (Quarantive Leave) :** পরিবারের কোন সদস্য কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে ২১ থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত এ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। এ ছুটি কর্মকালীন বলে গণ্য হয়।

১০। **কর্তব্যরত ছুটি (Duty Leave) :** নিম্নোক্ত বিষয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষককে কর্তব্যরত ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

চ) পরীক্ষা চালনা।

ছ) সরকারি পরিচালনা পরিষদ, শিক্ষা বো্র্ড, বিশ্ববিদ্যালয় বা যে কোন আইন সঙ্গত সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সম্ভাব্য সেমিনারে যোগদান।

জ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাপ্ত আদালতের আদেশ বলে আদালতে জুরী বা রাজসাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হওয়া।

ঝ) পারিশ্রমিক ছাড়া সরকার বা সরকারি সংস্থা বা শিক্ষা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত কোন কমিটির সভায় সদস্য হিসাবে যোগদান।

ঞ) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বা শিক্ষা বোর্ডের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বা সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে আইনসঙ্গত কোন সংস্থা বা সমিতিতে যোগদান।

অক্ষমতাজনিত বিশেষ ছুটি (Special Disability Leave) ঃ কোন সরকারি কর্মচারী অনভিপ্রেত কোন আঘাতের দ্বারা বা কারণে, অথবা স্বীয় দায়িত্ব সূচারুরূপে পালন করতে যেয়ে আহত হয়ে অক্ষম হলে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

ঘটনা সংগঠনের ৩ মাসের মধ্যে অক্ষমতা প্রকাশ না পাইলে এবং অক্ষম ব্যক্তি যথাযথ তৎপরতার সহিত ইহা কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত না করলে এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা যাবে না। তবে সরকার অক্ষমতার কারণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে, ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ৩ মাসের অধিক সময় পরেও অক্ষমতা প্রকাশ পেলে এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

বাধ্যতামূলক ছুটি

প্রকৃতপক্ষে বাধ্যতামূলক ছুটি নামে কোন ছুটি নাই। তবে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি-৫ (১) (এ) এর অধীনে বাধ্যতামূলক কার্যক্রমের অভিযোগে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে এবং বিধি-১১(১) এর অধীনে অসদাচরণ, ডিজারসন ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সাময়িক বরখাস্তের পরিবর্তে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে প্রাপ্যতা অনুযায়ী ছুটিতে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে উক্ত কর্মচারীদের ছুটি ভোগ বাধ্যতামূলক। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি-৩(২) তে বর্ণিত নাশকতামূলক কার্যের অভিযোগে কার্যক্রম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উক্ত বিধিমালার বিধি-৫(১) (১) এর অধীনে প্রাপ্ত ছুটির ভিত্তিতে আদেশে উল্লেখিত তারিখ হতে ছুটিতে যাবার লিখিত নির্দেশ দিতে পারেন।

১১। **অবসর প্রস্তুতি ছুটি (Leave Preparatory to retirement-LPR):** একজন সরকারি কর্মকর্তা ৫৮ বছর বয়স পর্যন্ত এ ছুটি ভোগ করতে পারেন। এ সময়ে ২ বছর ছুটি পাওনা থাকলে এক বছরের জন্য আগাম বেতন পান। বাকি এক বছরের মধ্যে ৬ মাস পূর্ণ গড় বেতনে এবং ৬ মাস অর্ধগড় বেতনে ছুটি পান। এল.পি.আর এ থাকা অবস্থায় বহি:বাংলাদেশ ছুটি প্রাপ্য ।

অবসর বিধি

খ) অবসর গ্রহণের বিধি–বিধান

সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকরির নির্দিষ্ট মেয়াদ অর্থাৎ ৫৭ বছর পূর্ণ হওয়ার পর অবসরকালীন সময়ে যে ভাতা পান তাকে অবসর ভাতা বা পেনশন বলে ।

কোন সরকারি কর্মচারী অবসর গ্রহণের পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে মৃত্যুর পর দিন হতে তার পরিবার বা মনোনীত ব্যক্তি একই ভাবে পারিবারিক পেনশন পাবে। অবসর গ্রহণের পর পেনশন ভোগকারীর মৃত্যু হলে ১৫ বছরের বাকী সময়ের জন্য তার পরিবার এ পেনশন পাবে, তবে স্বামী আজীবন এবং স্ত্রী পুনর্বিবাহ না করলে আজীবন পেনশন প্রাপ্য হবেন। যারা মৃত কর্মচারীর পেনশন ভোগ করতে পারেন তারা হল– সরকারি কর্মচারীর স্ত্রী অথবা স্বামী, ১৮ বছরের কম বয়সের বৈধ ছেলে, অবিবাহিত বৈধ কন্যা, মৃত পুত্রের স্ত্রী বা তার বৈধ ছেলে কিংবা অবিবাহিতা বৈধ কন্যা (কর্মচারীর আয়ের উপর নির্ভরশীল হলে) এবং বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত বিবাহিতা কন্যা

কিংবা মৃত পুত্রের বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী (কর্মচারীর আয়ের উপর নির্ভরশীল হলে)। অবসর গ্রহণের পূর্বে সরকারি কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে এবং স্বামী আজীবন ও স্ত্রী পুনর্বিবাহ না করলে আজীবন পেনশন প্রাপ্য হবেন।

অবসরজনিত অবসর ভাতা ছাড়াও আরও তিন ধরনের অবসর ভাতা রয়েছে। যেমন – (১) ক্ষতিপূরণমূলক অবসর ভাতা, (২) অক্ষমতাজনিত অবসর ভাতা ও (৩) ঐচ্ছিক অবসর ভাতা।

ক্ষতিপূরণ অবসর ভাতা : কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হলে স্থায়ী পদের কর্মকর্তা বা কর্মচারী ছাটাই হতে পারেন অথবা অন্যত্র যোগদানে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন। এমতাবস্থায় ক্ষতিপূরণমূলক অবসর ভাতা দেওয়া হয়ে থাকে।

অক্ষমতাজনিত অবসর ভাতা : কোন সরকারি কর্মচারী শারীরিক ও মানসিকভাবে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অক্ষমতাজনিত অবসর ভাতা পাবেন ।

ঐচ্ছিক অবসর ভাতা : কোন কর্মচারীর চাকুরির মেয়াদ ২৫ বছর পূর্ণ হলে স্বেচ্ছায় অবসর নিতে পারেন। এ ধরনের অবসরকে ঐচ্ছিক অবসর বলা হয় । এ ধরনের অবসর নিতে হলে ৩০ দিন পূর্বে লিখিতভাবে সরকারের নিকট আবেদন করতে হয় ।

বাধ্যতামূলক অবসর : কোন কর্মচারীকে একটি নির্দিষ্ট বয়সে উপনীত হইলে অর্থাৎ বার্ধক্যজনিত কারণে বাধ্যতামূলকভাবে চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। গণ কর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ জারীর পূর্বে বার্ধক্যজনিত কারণে অবসর গ্রহণের বয়স ছিল ৫৫ বৎসর। উক্ত আইন জারীর প্রেক্ষিতে ২২ নভেম্বর, ১৯৭৩ তারিখ হতে বার্ধক্যজনিত কারণে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধি করিয়া ৫৭ বৎসর করা হয়। গণ কর্মচারী বয়স ৫৭ বৎসর পূর্ণ হলে তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর গ্রহণ করতে হয়।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে বাধ্যতামূলক অবসর : সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ শৃঙ্খলামূলক কারণে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক দণ্ড হিসাবে যে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়, উহাকেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে বাধ্যতামূলক অবসর বলে। এইরূপ অবসর সংক্রান্ত বিধানসমূহ নিম্নরূপ :

ক) বাধ্যতামূলক অবসর গুরুদন্ড হিসাবে গণ্য। অক্ষমতা অসদাচরণ, ডিজারসন, দুর্নীতিপরায়ণ ও নাশকতামূলক অপরাধের জন্য এই অবসর দন্ড প্রযোজ্য।

খ) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধ:স্তন কোন কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কোন কর্মচারীকে বাধ্যতামূলক অবসর নিতে পারে না।

গ) ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলক অবসর দানের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। তবে পরামর্শকরণ রেগুলেশনের অনুচ্ছেদ-৭ অনুসারে

প্রতিরক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট পদে নিযুক্ত বেসামরিক কর্মকর্তা এবং এন এস আই এর কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলক অবসর দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মকমিশনের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন হবে না।

ভবিষ্যৎ তহবিলঃ

ক) প্রত্যেক স্থায়ী শিক্ষকের জন্য ভবিষ্যৎ তহবিলের ব্যবস্থা থাকবে। উক্ত তহবিলে প্রত্যেক শিক্ষক তার মাসিক মূল বেতনের ০.১০% এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমপরিমাণ অর্থ প্রতিমাসে জমা দিবেন।

খ) সার্ভিস বুক বা চাকরি খতিয়ান বহিঃ প্রত্যেক শিক্ষকের থাকা প্রয়োজন। এ খতিয়ান বহিঃগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান সংরক্ষণ করলে ভাল হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক শিক্ষকদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লিখার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

অবসর গ্রহণের সময় :

ক) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক তার বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হলে অবসর গ্রহণ করবেন।

খ) (১) কোন শিক্ষকের ৬০ বছর বয়স হওয়ার পরও পরিচালনা পরিষদ তাকে যোগ্য মনে করলে রেজিস্ট্রার্ড মেডিকেল অফিসার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের শারীরিক এবং মানসিক যোগ্যতার সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে ২ বছর+২বছর+১ বছর এ নীতিতে মোট পাঁচ বছর তার চাকরিকাল বর্ধিত করতে পারবে। তবে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বেতন ও ভাতাদির সরকারি অংশ পাবেন না।

(২) ৬০ বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোন শিক্ষকের চাকরিকাল একবার ২ (দুই) বছরের অধিক বৃদ্ধি করা যাবে না এবং প্রতিবার চাকরিকাল বৃদ্ধিতে মেডিকেল সার্টিফিকেট এবং পরিচালনা পরিষদের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

(৩) ৬৫ বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোন শিক্ষকের চাকরিকাল কোন ক্রমেই বৃদ্ধি করা যাবে না।

গ্রাচুইটিঃ

ক) কোন শিক্ষকের মৃত্যু হলে বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে/দীর্ঘদিনের অসুস্থতার কারণে চাকরি করতে অক্ষম হলে, চাকরি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তহবিল সংকুলানের ভিত্তিতে বিধি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে গ্রাচুইটি দেয়া যাবে।

যৌথ বীমাঃ

ক) প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের জন্য যৌথ বীমার ব্যবস্থা থাকবে। সরকারি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত/প্রস্তাবিত নীতি এবং পদ্ধতি মোতাবেক যৌথ বীমার ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

মূল্যায়ন

১. ছুটি কী ? ছুটির প্রকারভেদ উল্লেখ করুন।

২. বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ছুটির নিয়মকানুনগুলো আলোচনা করুন।

৩. অবসর গ্রহণের বিধিবিধানসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ক

(ক) শীতকালীন ছুটি
(খ) গ্রীষ্মকালীন ছুটি

পর্ব-খ
(ক) প্রসূতি ছুটি
(খ) চিকিৎসা ছুটি
(গ) সঙ্গ নিরোধ ছুটি
(ঘ) অক্ষমতাজনিত বিশেষ ছুটি

পর্ব-গ
(ক) ৬০
(খ) ৫
(গ) ৬৫

ইউনিট- ৯ **অধিবেশন- ৩**

ভূমিকা ও দায়িত্ব : বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও শিক্ষক অভিভাবক সমিতি

ভূমিকা

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের প্রয়োজনেই বিদ্যালয়ের সৃষ্টি। এ সব বিদ্যালয়ের সিংহভাগই বেসরকারি বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রশাসনের দায়িত্বে রয়েছেন প্রধান শিক্ষক। বিদ্যালয়ের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও তিনি কেবলমাত্র নিজ নেতৃত্বে কাজ করেন না। বিভিন্ন আইন কানুন, বিধি, প্রশাসনিক আদেশ, নির্দেশাবলি ইত্যাদির আওতায় থেকে তিনি বিদ্যালয় পরিচালনা করেন ।

বাংলাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে দুই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ এবং বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়। কিন্তু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বৈত নিয়ন্ত্রণাধীন। অর্থাৎ এসব প্রতিষ্ঠানের কতিপয় বিষয় দেখাশুনা করে সরকার এবং অন্যান্য বিষয়গুলো দেখার দায়িত্ব স্থানীয় জনগণের । ফলে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় এবং দায়িত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ও সরকারি সহায়তার সমন্বয়ে যাতে এসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে সে লক্ষ্যে বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা বা ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি গঠনের বিধান রয়েছে। ম্যানেজিং কমিটি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং গভর্নিং বডি বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট। ভাল একটি ম্যানেজিং কমিটির উপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও উন্নতি নির্ভর করে। বর্তমান অধিবেশনে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন পদ্ধতি ও কার্যকলাপ ও পি. টি. এ. সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি–

- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন

১৯৭৭ সালে জারিকৃত বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির বিধিমালা অনুযায়ী এর সদস্য সংখ্যা ১১ জন। এর মধ্যে সভাপতি ও সদস্য সচিব হবেন পদাধিকার বলে এবং বাকী নয়জন হবেন বিভিন্ন ক্যাটাগরী থেকে নির্বাচিত সদস্য। ম্যানেজিং কমিটির গঠন কাঠামো নিম্নরূপ :

১.	সভাপতি –(জেলা প্রশাসক বা তার মনোনীত ব্যক্তি, যেমন–অতিরিক্ত প্রশাসক বা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা অন্য নির্বাহী অফিসার সভাপতি হতে পারেন। জেলা সদরের বাইরের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে থানা নির্বাহী অফিসার, স্থানীয় শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, সমাজকর্মী , অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র কর্মকর্তা বা অন্য যে কোন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি সভাপতি নির্বাচিত হতে পারেন।	১ জন
২.	সদস্য সচিব (বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক –পদাধিকার বলে)	১ জন
৩.	শিক্ষক প্রতিনিধি (বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত)	২ জন
৪.	অভিভাবক প্রতিনিধি (অভিভাবকদের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত)	৪ জন
৫.	প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি (প্রতিষ্ঠাতাদের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত যিনি একসাথে পনের হাজার টাকা নগদে বা পণ্যের মাধ্যমে বিদ্যালয়কে প্রদান করবেন)	১ জন
৬.	দাতা প্রতিনিধি (দাতাদের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত যিনি একসঙ্গে দশ হাজার টাকা বিদ্যালয় ফান্ডে দান করবেন)	১ জন
৭.	বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন আঞ্চলিক উপ-পরিচালক কর্তৃক মনোনীত)	১ জন
		১১ জন

এছাড়া কমিটিতে একজন সহ-সভাপতি থাকবেন। তিনি কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। তবে সদস্য সচিব এবং শিক্ষক সদস্যগণ সহ–সভাপতি পদে নির্বাচনের যোগ্য হবেন না। কমিটির প্রথম সভাতেই সহ-সভাপতি নির্বাচিত হতে হবে। তিনি অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তবে পুরো প্যানেলের অনুমোদন দিয়ে থাকেন শিক্ষাবোর্ড ।

স্বায়ত্তশাসিত বিদ্যালয়ের কমিটি গঠনের কাঠামো (১১ জন সদস্য)

১. সভাপতি (সংস্থা প্রধান বা তার প্রতিনিধি) – ১ জন

২. সদস্য সচিব – প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা – ১ জন

৩. সদস্য – বিদ্যালয়ের ২ জন শিক্ষক (নির্বাচিত)

৪. অভিভাবক সদস্য – অভিভাবকদের মধ্য থেকে ২ জন (নির্বাচিত)

৫. সংস্থার প্রধান কর্তৃক ৩ জন মনোনীত সদস্য

৬. বিদ্যোৎসাহী সদস্য - ২জন। একজন বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত, অন্যজন আঞ্চলিক উপ-পরিচালক কর্তৃক মনোনীত।

তাহলে শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার আসুন ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচিত ও অনির্বাচিত বা মনোনীত সদস্যবৃন্দের তালিকা নিম্নের ছকে সাজাই:

নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ	অনির্বাচিত সদস্যবৃন্দ

পর্ব-খঃ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে :

১। বিদ্যালয় স্থাপন, পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা;

২। শিক্ষক নিয়োগ, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত ও অপসারণ;

৩। নৈমিত্তিক ছুটি বাদে অন্যান্য ছুটি মঞ্জুর;

৪। উন্নয়ন প্রকল্পসহ উন্নয়ন বাজেট ও বার্ষিক বাজেট অনুমোদন;

৫। শিক্ষক কাউন্সিলের সুপারিশের ভিত্তিতে ছাত্রদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের আবেদন মঞ্জুর;

৬। ছুটির দিনের তালিকা অনুমোদন;

৭। অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত দান যেগুলো কমিটির সামনে আনা হবে;

৮। ছাত্রদের স্থান সংকুলান ও শিক্ষকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা;

৯। জমি, ভবন, খেলার মাঠ, বই, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের আয়োজন করা ।

১০। রিজার্ভ ফান্ড, ভবন ফান্ড, খেলাধুলার ফান্ড, লাইব্রেরী ফান্ড, পুরস্কার ফান্ড, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পরীক্ষা ফান্ড, গ্রাচুইটি ফান্ড, বেনেভোলেন্ট ফান্ড এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফান্ড সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

১১। স্কুলের মাঠ, ভবন ও অন্যান্য সম্পত্তির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ;

১২। শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন ভাতা মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রদানের ব্যবস্থা করা;

১৩। স্কুলের সন্তোষজনক কার্যক্রম নিশ্চিত করা;

১৪। অ-আদায়যোগ্য ঋণ মওকুফ করা, বিনষ্ট যন্ত্রপাতি নিস্পত্তি ও দায়সমূহের অর্থ প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া;

১৫। প্রিসেশন সম্মেলনের ব্যবস্থা করা যাতে গত বছরের কর্ম মূল্যায়ন ও আগামী বছরের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা;

১৬। বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত নির্দেশনা বলে কমিটি ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবে।

১৭। কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য কমিটি সাব-কমিটি গঠন করতে পারবে। এছাড়া একটি স্ট্যান্ডিং অর্থ সাব-কমিটি থাকবে যা প্রতি মাসে সভা করবে ও স্কুলের প্রতি মাসের হিসাব নিরীক্ষা করবে।

তবে ম্যানেজিং কমিটি নিম্নলিখিত দুটি ক্ষেত্রে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না।

১। স্কুলের নাম পরিবর্তন বা স্থান পরিবর্তনের বিষয়ে বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না।

২। বোর্ডের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষককে অপসারণ বা বরখাস্ত করা যাবে না।

তাহলে আসুন বন্ধুরা, এবার নিম্নের প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করি।

(ক) স্কুলের কোন শিক্ষার্থীর উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ হওয়ার বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি কী সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবে?

(খ) কোন দুটি ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটি এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে না ?

(ক)

(খ)

পর্ব-গঃ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির গুরুত্ব

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভের জন্য ম্যানেজিং কমিটির উপস্থিতি একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। ম্যানেজিং কমিটি শিক্ষকদের জবাবদিহিতা ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে, অভিভাবক ও সমাজের সাথে যোগাযোগ করে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয়ের জন্য তহবিল সংগ্রহ ও বিদ্যালয় ক্যাচমেন্ট এরিয়া হতে ছাত্র সংগ্রহ করায় কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও শিক্ষকদের এম.পি.ও. ভুক্তি ও তাদের টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে কমিটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কতিপয় দিক দেখাশুনা করলেও বাকী বিষয়গুলো দেখার দায়িত্ব স্থানীয় জনসাধারণের। তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিধিবদ্ধ পদ্ধতি অনুযায়ী ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়ে থাকে। এদিক দিয়ে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির গুরুত্ব অপরিসীম ।

ম্যানেজিং কমিটির উপর বেসরকারি বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে আমাদের দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটি সক্রিয় ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। এতে একাডেমিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষার গুণগতমানের অবনতি, পাবলিক পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতি ও পাশের নিম্নহার, শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা ইত্যাদি ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব কেবল সরকার বা শিক্ষকমণ্ডলীর নয়, ম্যানেজিং কমিটির সুষ্ঠু দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতাও এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। জাতীয় শিক্ষার মান বাড়াতে হলে, উত্তম প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার নিশ্চয়তা বিধানে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হলে, ম্যানেজিং কমিটিকে সক্রিয় হতে ও যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রয়োজনে এর রূপরেখা ঢেলে সাজাতে হবে এবং যথাযথ জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে। ম্যানেজিং কমিটির সৎ, দক্ষ, নিরপেক্ষ ও সক্রিয় ভূমিকা ব্যতীত সুষ্ঠু বিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রত্যাশা করা কল্পনাপ্রসূত ।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির জবাবদিহিতা কীভাবে করা যায়? সম্ভাব্য ৩টি উপায় লিখুন।

১.
২.
৩.

পর্ব-ঘ : শিক্ষক অভিভাবক কমিটির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

আমাদের দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে নামে মাত্র পিটিএ রয়েছে, কিন্তু দৃশ্যত এর কোন কর্মকান্ড নেই। বিদ্যালয়ে যাবতীয় কাজের আয়োজন ও বাস্তবায়ন তদারকির দায়িত্ব বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির। এ কমিটিতে ৪ জন অভিভাবক ও ২/৩ জন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি সম্পৃক্ত হন। এত কমসংখ্যক ব্যক্তিবর্গের পক্ষে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা বেশ কঠিন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে ৬ থেকে ৭ ঘণ্টা অবস্থান করে। বাকী সময় সে কাটায় তার পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে । বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার অগ্রগতি কীরূপ, কোন বিষয়ে তার কী সবল ও দুর্বল দিক রয়েছে, দুর্বল দিকগুলো দূর করার প্রচেষ্টায় শিক্ষক ও অভিভাবকদের সমন্বয়ে কী নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, অভিভাবক শিক্ষার্থীর কোন কোন দিকে বিশেষভাবে নজর দেবেন, কীভাবে বিদ্যালয়ে তাদের হাজিরা নিশ্চিত করবেন ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনার জন্য প্রতিটি বিষয় শিক্ষকের সঙ্গে অভিভাবকের যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যকীয়। শিক্ষক অভিভাবকের সাথে যৌথ প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নতিতে পিটিএ বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

আমাদের দেশের অনেক অভিভাবক আছেন, যারা তাদের সন্তানের লেখাপড়ার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের উপর ছেড়ে দেন। নিজেরা সন্তানের লেখাপড়ার খোঁজ খবর রাখেন না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথেও তেমন যোগাযোগ করেন না। এমতাবস্থায় তার সুষ্ঠু লেখাপড়ার কাজটি ব্যাহত হয়। কখনও কখনও নানারূপ অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এতে বিদ্যালয়ের

পরিবেশও নষ্ট হতে পারে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে এবং বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন ঘটাতে হলে এ ধরনের সমিতি গঠনের প্রয়োজন রয়েছে।

অভিভাবকগণের তুলনায় শিক্ষকগণই সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করছেন যে অভিভাবকগণের প্রকৃত সহযোগিতার ফলে শিক্ষকগণ তাঁদের দায়িত্ব সম্পাদনে অধিকতর সাফল্য লাভ করে থাকেন। তাই শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে শিক্ষার্থীর সুশিক্ষার স্বার্থে অভিভাবকের সহযোগিতা লাভ করা শিক্ষকগণের কর্তব্য।

বন্ধুরা আসুন, এবার আমরা নিম্নের ছক নিয়ে চিন্তা করি এবং ছকের শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা করি।

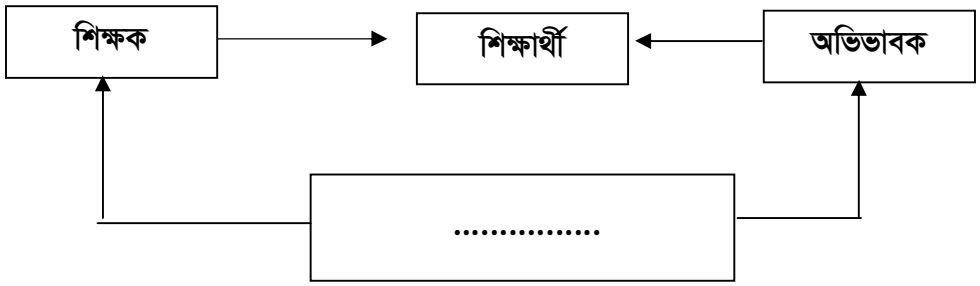

ইউনিট - ৯ **অধিবেশন -৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের প্রয়োজনেই বিদ্যালয়ের সৃষ্টি। এসব বিদ্যালয়ের সিংহভাগই বেসরকারি বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রশাসনের দায়িত্বে রয়েছেন প্রধান শিক্ষক। বিদ্যালয়ের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজ নেতৃত্বে কাজ করেন না। বিভিন্ন আইন কানুন, বিধি, প্রশাসনিক আদেশ, নির্দেশাবলি ইত্যাদির আওতায় থেকে তিনি বিদ্যালয় পরিচালনা করেন ।

বাংলাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে দুই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ এবং বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়। কিন্তু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বৈত নিয়ন্ত্রণাধীন। অর্থাৎ এসব প্রতিষ্ঠানের কতিপয় বিষয় দেখাশুনা করে সরকার এবং অন্যান্য বিষয়গুলো দেখার দায়িত্ব স্থানীয় জনগণের। ফলে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় এবং দায়িত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ও সরকারি সহায়তার সমন্বয়ে যাতে এসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে সে লক্ষ্যে বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা বা ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি গঠনের বিধান রয়েছে। ম্যানেজিং কমিটি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং গভর্নিং বডি বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট। ভাল একটি ম্যানেজিং কমিটির উপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও উন্নতি নির্ভর করে। বর্তমান অধিবেশনে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন পদ্ধতি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন

কমিটি গঠন

১৯৭৭ সালে জারীকৃত বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির বিধিমালা অনুযায়ী এর সদস্য সংখ্যা ১১ জন । এর মধ্যে সভাপতি ও সদস্য সচিব হবেন পদাধিকার বলে এবং বাকী নয়জন হবেন বিভিন্ন ক্যাটাগরী থেকে নির্বাচিত সদস্য, ম্যানেজিং কমিটির গঠন কাঠামো নিম্নরূপ :

১. সভাপতি –(জেলা প্রশাসক বা তার মনোনীত ব্যক্তি, যেমন–অতিরিক্ত ১ জন
জেলা প্রশাসক বা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা অন্য নির্বাহী অফিসার সভাপতি হতে পারেন। জেলা সদরের বাইরের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে থানা নির্বাহী অফিসার,
স্থানীয় শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, সমাজকর্মী , অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র কর্মকর্তা বা অন্য যে কোন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি সভাপতি নির্বাচিত হতে পারেন।

২.	সদস্য সচিব (বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক –পদাধিকার বলে)	১ জন
৩.	শিক্ষক প্রতিনিধি (বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত)	২ জন
৪.	অভিভাবক প্রতিনিধি (অভিভাবকদের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত)	৪ জন
৫.	প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি (প্রতিষ্ঠাতাদের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত যিনি একসাথে পনের হাজার টাকা নগদে বা পণ্যের মাধ্যমে বিদ্যালয়কে প্রদান করবেন)	১ জন
৬.	দাতা প্রতিনিধি (দাতাদের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত যিনি একসঙ্গে দশ হাজার টাকা বিদ্যালয় ফান্ডে দান করবেন)	১ জন
৭.	বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন আঞ্চলিক উপ-পরিচালক কর্তৃক মনোনীত)	১ জন
		১১ জন

এছাড়া কমিটিতে একজন সহ-সভাপতি থাকবেন। তিনি কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। তবে সদস্য সচিব এবং শিক্ষক সদস্যগণ সহ–সভাপতি পদে নির্বাচনের যোগ্য হবেন না। কমিটির প্রথম সভাতেই সহ-সভাপতি নির্বাচিত হতে হবে। তিনি অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তবে পুরো প্যানেলের অনুমোদন দিয়ে থাকেন শিক্ষাবোর্ড ।

স্বায়ত্তশাসিত বিদ্যালয়ের কমিটি গঠনের কাঠামো (১১ জন সদস্য)

১. সভাপতি (সংস্থা প্রধান বা তার প্রতিনিধি) – ১ জন

২. সদস্য সচিব – প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা – ১ জন

৩. সদস্য – বিদ্যালয়ের ২ জন শিক্ষক (নির্বাচিত)

৪. অভিভাবক সদস্য – অভিভাবকদের মধ্য থেকে ২ জন (নির্বাচিত)

৫. সংস্থার প্রধান কর্তৃক ৩ জন মনোনীত সদস্য

৬. বিদ্যোৎসাহী সদস্য - ২জন । একজন বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত, অন্যজন আঞ্চলিক উপ পরিচালক কর্তৃক মনোনীত ।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ

মেয়াদ

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ হবে প্রথম সভার তারিখ থেকে তিন বছর । নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নব নির্বাচিত কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী কমিটি বিদ্যালয়ের কার্যাবলি পরিচালনা করবে । কমপক্ষে ৫ জন সদস্য সভায় উপস্থিত থাকলে কোরাম হবে অর্থাৎ কমিটি তার সভা চালিয়ে যেতে পারবে।

সভা অনুষ্ঠান

সভা

কমিটি প্রতিবছর কমপক্ষে ৬(ছয়) টি সভা অনুষ্ঠিত করবে। দুটি সভার অন্তঃবর্তীকালীন সময় কোন অবস্থাতেই ৬০ দিনের বেশি হতে পারবে না। সভাপতির সাথে আলোচনা করে সদস্য সচিব সভার সময় ও তারিখ নির্ধারণ করবেন। সভাপতি সভা আহ্বান করতে পারবে। সকল সভা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য সাত দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হবে। তবে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে সদস্য সচিব সভাপতির পরামর্শক্রমে জরুরি সভা আহবান করতে পারেন।

কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া

কমিটির অদক্ষতা, আর্থিক অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হলে বা শৃঙ্খলা ও আচরণ ভঙ্গের কারণে অসন্তোষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা আঞ্চলিক উপ পরিচালক (মাধ্যমিক) এর সুপারিশের ভিত্তিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ম্যানেজিং কমিটি ভেঙ্গে দিতে পারবে। তবে এর পূর্বে বোর্ড কর্তৃক কমিটিকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হবে। জবাব মনঃপুত না হলে বোর্ড ম্যানেজিং কমিটি ভেঙ্গে দিবে এবং ম্যানেজিং কমিটির ভেঙ্গে দেওয়া তারিখ থেকে কমিটি কার্যকারিতা হারাবে।

এডহক কমিটি

এডহক কমিটি

মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কমিটি ভেঙ্গে দিলে বোর্ড সাময়িকভাবে কাজ পরিচালনার জন্য ছয় মাসের একটি এডহক কমিটি গঠন করবে। এডহক কমিটিতে পাঁচ জন সদস্য থাকবেন ।

১. সভাপতি – ১ জন (জেলা/থানা শিক্ষা কর্মকর্তা , পদাধিকার বলে)
২. সদস্য সচিব – ১ জন (প্রধান শিক্ষক, পদাধিকার বলে)
৩. সদস্য – ১ জন (শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি)
৪. সদস্য - ১ জন (উপ পরিচালক কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি)
৫. সদস্য - ১ জন (স্থানীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি)

তিনজন সদস্যের উপস্থিতিতে এডহক কমিটির কোরাম হবে । এই কমিটি নিয়মিতভাবে কমিটির সকল কাজ পরিচালনা করবে । এর প্রধান দায়িত্ব হবে নিয়মিত কমিটি গঠনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ।

কমিটির সদস্যপদের অযোগ্যতা

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ম্যানেজিং কমিটিতে সদস্য হতে বা সদস্য হিসেবে থাকতে পারবেন না ।

ক) রাষ্ট্রের নাশকতামূলক কাজে অংশগ্রহণ বা সহায়তা করলে;

খ) অর্থনৈতিক কাজের দরুন কোন আদালতে সাজাপ্রাপ্ত হলে;

গ) শিক্ষক বাদে স্কুলের কোন কর্মচারী হলে এবং

ঘ) পর পর তিনটি সভায় সভাপতি কর্তৃক ছুটি প্রদান ছাড়া অনুপস্থিত থাকলে ।

কমিটির আর্থিক কার্যকলাপ

কমিটি স্কুলের নামে পোস্টাল সেভিংস ব্যাংকে কিংবা সিডিউল ব্যাংকে একটি একাউন্ট খুলবে। তিন শত টাকার বেশি হলে তা স্কুলের একাউন্ট– এ জমা দিতে হবে। ব্যাংক একাউন্ট সহ–সভাপতি ও সদস্য সচিবের যুগ্ম স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে কমিটি কর্তৃক মনোনীত সদস্যের স্বাক্ষরসহ একাউন্ট পরিচালিত হবে ।

ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য

কমিটির ক্ষমতা

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে ।

১। বিদ্যালয় স্থাপন, পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা;

২। শিক্ষক নিয়োগ, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত ও অপসারণ;

৩। নৈমিত্তিক ছুটি বাদে অন্যান্য ছুটি মঞ্জুর;

৪। উন্নয়ন প্রকল্পসহ উন্নয়ন বাজেট ও বার্ষিক বাজেট অনুমোদন;

৫। শিক্ষক কাউন্সিলের সুপারিশের ভিত্তিতে ছাত্রদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের আবেদন মঞ্জুর;

৬। ছুটির দিনের তালিকা অনুমোদন;

৭। অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত দান যেগুলো কমিটির সামনে আনা হবে;

৮। ছাত্রদের স্থান সংকুলান ও শিক্ষকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা;

৯। জমি, ভবন, খেলার মাঠ, বই, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের আয়োজন করা ।

১০। রিজার্ভ ফান্ড, ভবন ফান্ড, খেলাধুলার ফান্ড, লাইব্রেরী ফান্ড, পুরস্কার ফান্ড, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পরীক্ষা ফান্ড, গ্রাচুইটি ফান্ড, বেনেভোলেন্ট ফান্ড এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফান্ড সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

১১। স্কুলের মাঠ, ভবন ও অন্যান্য সম্পত্তির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ;

১২। শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন ভাতা মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রদানের ব্যবস্থা করা;

১৩। স্কুলের সন্তোষজনক কার্যক্রম নিশ্চিত করা;

১৪। অআদায়যোগ্য ঋণ মওকুফ করা, বিনষ্ট যন্ত্রপাতি নিস্পত্তি ও দায়সমূহের অর্থ প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া;

১৫। প্রিসেশন সম্মেলনের ব্যবস্থা করা যাতে গত বছরের কর্ম মূল্যায়ন ও আগামী বছরের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা;

১৬। বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত নির্দেশনা বলে কমিটি ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবে।

১৭। কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য কমিটি সাব-কমিটি গঠন করতে পারবে। এছাড়া একটি স্ট্যান্ডিং অর্থ সাব-কমিটি থাকবে যা প্রতি মাসে সভা করবে ও স্কুলের প্রতি মাসের হিসাব নিরীক্ষা করবে।

তবে ম্যানেজিং কমিটি নিম্নলিখিত দুটি ক্ষেত্রে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না।

১। স্কুলের নাম পরিবর্তন বা স্থান পরিবর্তনের বিষয়ে বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না।

২। বোর্ডের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষককে অপসারণ বা বরখাস্ত করা যাবে না ।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভের জন্য ম্যানেজিং কমিটির উপস্থিতি একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। ম্যানেজিং কমিটি শিক্ষকদের জবাবদিহিতা ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে, অভিভাবক ও সমাজের সাথে যোগাযোগ করে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয়ের জন্য তহবিল সংগ্রহ ও বিদ্যালয় ক্যাচমেন্ট এরিয়া হতে ছাত্র সংগ্রহ করায় কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও শিক্ষকদের এম.পি.ও. ভুক্তি ও তাদের টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে কমিটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কতিপয় দিক দেখাশুনা করলেও বাকী বিষয়গুলো দেখার দায়িত্ব স্থানীয় জনসাধারণের। তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিধিবদ্ধ পদ্ধতি অনুযায়ী ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়ে থাকে। এদিক দিয়ে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির গুরুত্ব অপরিসীম ।

ম্যানেজিং কমিটির বেসরকারি বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে আমাদের দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটি সক্রিয় ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। এতে একাডেমিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষার গুণগতমানের অবনতি, পাবলিক পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতি ও পাশের নিম্নহার, শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা ইত্যাদি ব্যর্থতার

দায়দায়িত্ব কেবল সরকার বা শিক্ষকমণ্ডলীর নয়, ম্যানেজিং কমিটির সুষ্ঠু দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতাও এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। জাতীয় শিক্ষার মান বাড়াতে হলে, উত্তম প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার নিশ্চয়তা বিধানে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হলে, ম্যানেজিং কমিটিকে সক্রিয় হতে ও যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রয়োজনে এর রূপরেখা ঢেলে সাজাতে হবে এবং যথাযথ জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে। ম্যানেজিং কমিটির সৎ, দক্ষ, নিরপেক্ষ ও সক্রিয় ভূমিকা ব্যতীত সুষ্ঠু বিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রত্যাশা করা কল্পনা প্রসূত ।

শিক্ষক – অভিভাবক সমিতি (পিটিএ)

পিটিএ

আমাদের দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে নামে মাত্র পিটিএ রয়েছে কিন্তু দৃশ্যত এর কোন কর্মকান্ড নেই। বিদ্যালয় যাবতীয় কাজের আয়োজন ও বাস্তবায়ন তদারকির দায়িত্ব বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির। এ কমিটিতে ৪জন অভিভাবক ও ২/৩ জন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি সম্পৃক্ত হন। এত কমসংখ্যক ব্যক্তিবর্গের পক্ষে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা বেশ কঠিন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে ৬ থেকে ৭ ঘণ্টা অবস্থান করে। বাকী সময় সে কাটায় তার পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার অগ্রগতি কিরূপ, কোন বিষয়ে তার কী সবল ও দুর্বল দিক রয়েছে, দুর্বল দিকগুলো দূর করার প্রচেষ্টায় শিক্ষক ও অভিভাবকদের সমন্বয়ে কী নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, অভিভাবক শিক্ষার্থীর কোন কোন দিকে বিশেষভাবে নজর দেবেন, কীভাবে বিদ্যালয়ে তাদের হাজিরা নিশ্চিত করবেন ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনার জন্য প্রতিটি বিষয় শিক্ষকের সঙ্গে অভিভাবকের যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যকীয়। শিক্ষক অভিভাবকের সাথে যৌথ প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নতিতে পিটিএ বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

আমাদের দেশের অনেক অভিভাবক আছেন, শিক্ষকদের যাঁরা তার সন্তানের লেখাপড়ার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের উপর ছেড়ে দেন। নিজেরাও সন্তানের লেখাপড়ার খোঁজ খবর রাখেন না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথেও তেমন যোগাযোগ করেন না এমতাবস্থায় তার সুষ্ঠু লেখাপড়ার কাজটি ব্যাহত হয়। কখনও কখনও নানারূপ অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এতে বিদ্যালয়ের পরিবেশও নষ্ট হতে পারে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে এবং বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন ঘটাতে হলে এ ধরনের সমিতি গঠনের প্রয়োজন রয়েছে।

অভিভাবকগণের তুলনায় শিক্ষকগণই সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করছেন যে অভিভাবকগণের প্রকৃত সহযোগিতার ফলে শিক্ষকগণ তাঁদের দায়িত্ব সম্পাদনে অধিকতর সাফল্য লাভ করে থাকেন। তাই শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে শিক্ষার্থীর সুশিক্ষার স্বার্থে অভিভাবকের সহযোগিতা লাভ করা শিক্ষকগণের কর্তব্য বলে আমাদের দেশের অভিভাবকগণের শিক্ষা-দীক্ষা

ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে আমরা স্থির করতে পারি। এখন এ সম্পর্কে বিদ্যালয়ের পক্ষে গ্রহণযোগ্য উপায়সমূহ সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে।

১। শিক্ষক অভিভাবককে প্রকাশ্য বৈঠকে ডাকতে পারেন। নতুন ভর্তি শেষে অভিভাবকদের সভা আহবান করে বিদ্যালয়-শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা নিতে পারেন। অভিভাবকগণ নিজ নিজ সন্তানের আচরণ সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারেন। বিদ্যালয় এ সুযোগে বিদ্যালয়ের সারা বৎসরের কাজের পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং নিয়ম-বিধি সম্পর্কে আলোচনায় অভিভাবকগণের অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা কামনা করতে পারে। এদের মত বিনিময়ের দ্বারা উভয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে।

২। বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানে (যেমন, জাতীয় অনুষ্ঠানাদি, পুরস্কার বিতরণী, মিলাদ মাহফিল, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া, নাটক, পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠান) অভিভাবকগণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদ্যালয়ের কর্মধারা ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা দেয়া যেতে পারে। এতে তারা আনন্দিত ও বিদ্যালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ হবেন।

৩। শিক্ষার্থীদের কাজের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে তা সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখলে এবং অভিভাবকদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানালে শিক্ষক-অভিভাবক সহযোগিতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

৪। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি ব্যক্তিগত নোট বই রাখতে বিদ্যালয় বাধ্য করবে। শিক্ষকগণ তাতে পাঠে অগ্রগতির অন্তরায়মূলক শিক্ষার্থীর আচরণ লিপিবদ্ধ করবেন। পড়া শিখে না আসা, বাড়ির কাজ না আনা, অননুমোদিত অনুপস্থিতি, বা কোনও অসামাজিক আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষকের মন্তব্য অভিভাবকের গোচরীভূত করার ব্যবস্থা থাকবে।

৫। এ ছাড়া অভিভাবক কর্তৃক নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকতে পারে। দৈনিক নির্দিষ্ট সময়, সাপ্তাহিক বা মাসিক 'অভিভাবক দিবস' নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। নিয়মিত নির্দিষ্ট পরিদর্শন ছাড়াও অভিভাবকের জন্য শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পাঠদান পরিদর্শনের প্রাত্যহিক সুবিধা উন্মুক্ত রাখা যেতে পারে।

৬। এস.এস.সি পরীক্ষার ফলাফলে বিশেষ কৃতী ছাত্রদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অভিভাবকগণকে আহ্বান করে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

৭। কোন শিক্ষার্থীর অসামাজিক আচরণের প্রেক্ষিতে তার অভিভাবককে বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। বিদ্যালয় এক তরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে অভিভাবক মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৮। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, রাস্তা সংস্কার, মশা নিরোধন অভিযান ইত্যাদি সমাজ সেবামূলক এলাকাভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করে অভিভাবক ও সমাজের প্রশংসা ও সহযোগিতা লাভে বিদ্যালয় ধন্য হতে পারে।

৯। শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও চারিত্রিক উন্নতির পর্যায়ক্রমিক রিপোর্ট এবং আরো উন্নতির বা সংশোধনের উপায় নির্দেশ সম্বলিত বিবরণী অভিভাবকের অবগতি ও মন্তব্যের জন্য বৎসরে ৩/৪ বার প্রেরণ করা যেতে পারে। এতে শিক্ষক অভিভাবক উভয়েই শিক্ষার্থীর প্রতি যত্নশীল হওয়ার অবকাশ পান।

১০। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতে অভিভাবকগণের পক্ষ থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি কাজ করে থাকেন। তারা বিদ্যালয় এলাকার পক্ষ থেকে বিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শান্তি-শৃঙ্খলাজনিত সকল ব্যাপারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ ও সহায়তা দান করে থাকেন।

১১। শিক্ষকগণ বিদ্যালয় এলাকা ভাগ করে বিভিন্ন শিক্ষক বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষার্থীদের গৃহ পরিবেশ সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের বাড়িতে গমন করে অভিভাবকগণের সাথে মত বিনিময় করতে পারেন।

১২। বিদ্যালয়ের উদ্যোগে অভিভাবকগণের জন্য কর্মশিবির অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। এ সব কর্মশিবিরে বিদ্যালয় ও গৃহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের বিভিন্ন উপায় স্থির করা যেতে পারে। শিশু-মনোবিজ্ঞান, শিশুর ক্রমবিকাশের জন্য শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ের প্রতি অভিভাবকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা হতে পারে।

১৩। শ্রেণি শিক্ষকের জন্য শিক্ষার্থীর নোট-বই, অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল, অগ্রগতির সাময়িক রিপোর্ট ছাড়াও অভিভাবকের নিকট শিক্ষক সময় সময় শিক্ষার্থীর আচরণ সম্পর্কে ভাল-মন্দ রিপোর্ট শিক্ষার্থীর মাধ্যমে পাঠাতে পারেন। এতে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপদেশমূলক বক্তব্য থাকতে পারে। অভিভাবকও অনুরূপ রিপোর্ট শিক্ষককে পাঠাবেন। নানা সমস্যার কারণে বাঞ্ছিত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের বিকল্প হিসেবে এ ব্যবস্থা পরীক্ষা করা দেখা যেতে পারে।

১৪। অন্যান্য দেশের মত শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি গঠন করে এর মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও পারিবারিক পরিবেশ একে অন্যের পরিপূরক হওয়া বাঞ্ছনীয়। গোটা সমাজ ব্যবস্থার সাথে একটি গৃহ-পরিবেশ পুরোপুরি সম্পৃক্ত। তাই অভিভাবকগণ কেবল নিজ নিজ সন্তানের জন্য নিজ গৃহ সম্পর্কে সচেতন হলেই চলে না, বরং সমাজ সচেতন নাগরিক হিসেবে সমাজের সকল শিক্ষার্থীর জন্য উপযোগী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে তাঁদের অংশগ্রহণ করতে হবে। অভিভাবক ও শিক্ষক যদি মিলেমিশে পরস্পর সহযোগিতায় কাজ করেন তবে যে সকল বাধা-বিঘ্ন শিক্ষার্থীর উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আছে তা উত্তরণের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালান তবে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ নৈতিক, আধ্যাত্মিক, দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে তাদের অন্তর্নিহিত শক্তি প্রয়োগ করে সর্বাঙ্গীন উন্নতির আমোঘ সুযোগ লাভ করবে।

শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ছাড়াও অন্যান্য দিকের অগ্রগতি এবং বিদ্যালয়ের নানা কর্মকান্ড ও পরিবেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষক অভিভাবক সমিতি গঠন ও প্রতি সাময়িকী পরীক্ষার পূর্বে বা পরে শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির আলোচনার ব্যবস্থা নিলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর হাজিরা নিশ্চিত করা যাবে, প্রতি সাময়িকী ও পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের উন্নতি ঘটবে, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর পরিমাণগত ও গুণগতমানও বৃদ্ধি পাবে এবং সকলের কাছে বিদ্যালয়ের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যাবে ।

আমরা চাই আমাদের বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে এমন শক্তি সহযেগিতা ও মূল্যবোধ জেগে উঠুক যাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠবে উন্নততর বিদ্যালয় ও সমাজ যেখানে শিক্ষার্থীরা সার্থক শিক্ষা লাভ করে বৃহত্তর মানুষে রূপান্তরিত হবে।

মূল্যায়ন

১. বেসরকারি ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সরকার ও স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ সমান গুরুত্বপূর্ণ - ব্যাখ্যা করুন।

২. বেসরকারি স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটর গঠন বর্ণনা করুন।

৩. শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু শিক্ষাদানে শিক্ষক অভিভাবক সমিতির গুরুত্ব সম্পর্কে লিখুন।

৪. বেসরকারি বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করুন।

৫. বেসরকারি বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ক

নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ	অনির্বাচিত সদস্যবৃন্দ
শিক্ষক প্রতিনিধি	সভাপতি
অভিভাবক প্রতিনিধি	সদস্য সচিব
প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি	বিদ্যাৎসাহী প্রতিনিধি
দাতা প্রতিনিধি	অনির্বাচিত প্রতিনিধি
নির্বাচিত প্রতিনিধি	

পর্ব-খ

(ক) না, (খ) স্কুলের নাম পরিবর্তন ও শিক্ষককে বরখাস্ত বা অপসারণ।

পর্ব-খ

১. স্থানীয় জনসাধারণের সাথে বৈঠক

২. সরকারি কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন

৩. অভিভাবক সমিতি গঠন ও তাদের সাথে মতবিনিময়।

পর্ব-ঘ

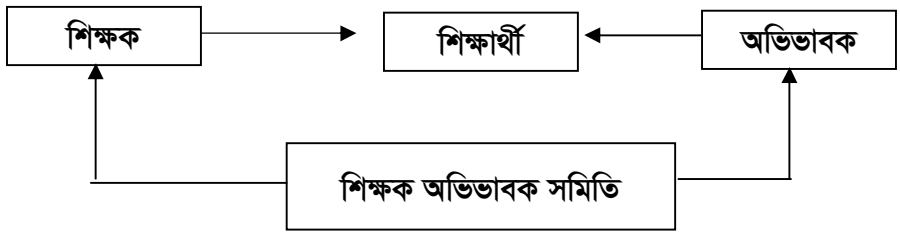

ইউনিট- ৯ **অধিবেশন -৪**

শিক্ষকের আইনগত ও নৈতিক দায়িত্ব ও অধিকার

ভূমিকা

শিক্ষকতা কোন সাধারণ চাকুরি নয়, এটি একটি পেশা বলা হয় মহৎ পেশা। শিক্ষক বলতেই মনে করা হয় তিনি একজন আদর্শ ব্যক্তি, অনুসরণীয় ব্যক্তি, শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে অনুসরণ করে, সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিরা তাঁকে সম্মান করে। সম্মান অর্জন ও ধরে রাখার জন্য তাঁকে আদর্শ হয়েই চলতে হয়। শিক্ষক জাতি গড়ার কারিগর। এজন্য সমাজ তাঁর নিকট থেকে অনেক কিছু আশা করে। শিক্ষককে সেজন্য সমাজে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ দায়িত্বগুলো হতে পারে নৈতিক বা আইনগত। যেহেতু তিনি দায়িত্ব পালন করেন সেহেতু তাঁরও সমাজ ও রাষ্ট্রের নিকট থেকে কিছু প্রাপ্য আছে যাকে আমরা অধিকার বলে আখ্যায়িত করতে পারি। এ অধিবেশনে আমরা শিক্ষকের সে দায়িত্ব ও অধিকার নিয়ে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি–

- শিক্ষকের আইনগত দায়িত্বসমূহ বলতে পারবেন।
- শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্বসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শিক্ষকের আইনগত অধিকার সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- শিক্ষকের নৈতিক অধিকারসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : শিক্ষকের আইনগত দায়িত্ব

আমরা যদি একটুখানি চিন্তা করি তাহলে বুঝতে পারি শিক্ষক কাজ করেন একটি দেশের মধ্যে অবস্থিত শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের ভেতর। সে দেশের থাকে সংবিধান, আর প্রতিষ্ঠানেরও থাকে আইন-কানুন শৃঙ্খলাবিধি। শিক্ষক যখন শিক্ষাদান বা তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন তখন তিনি প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন ও আচরণবিধি মেনে চলেন। আমরা নিচের ছকের সাহায্যে শিক্ষকের সে আইনগত দায়িত্ব তুলে ধরতে পারি -

পর্ব-খঃ শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্ব

শিক্ষকতা পেশা একটি ব্রত। এ পেশায় ভালো করার জন্য চাই নিরলস সাধনা। শিক্ষক তাঁর পেশার প্রতি থাকবেন অঙ্গীকারবদ্ধ ও একাগ্র। তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে সবসময় থাকবেন সচেতন। কর্মে প্রদর্শন করবেন দক্ষতা। যেহেতু তিনি জ্ঞান বিতরণ করবেন সেজন্য তার থাকবে নিরলস জ্ঞান চর্চা। জীবন ও পেশা সম্পর্কে তার থাকতে হবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী। সমাজের একজন সচেতন ব্যক্তি হিসেবে সামাজিক কর্মকাণ্ডেও তার থাকবে অবদান। নিচের ছকের সাহায্যে আমরা শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্ব তুলে ধরতে পারি।

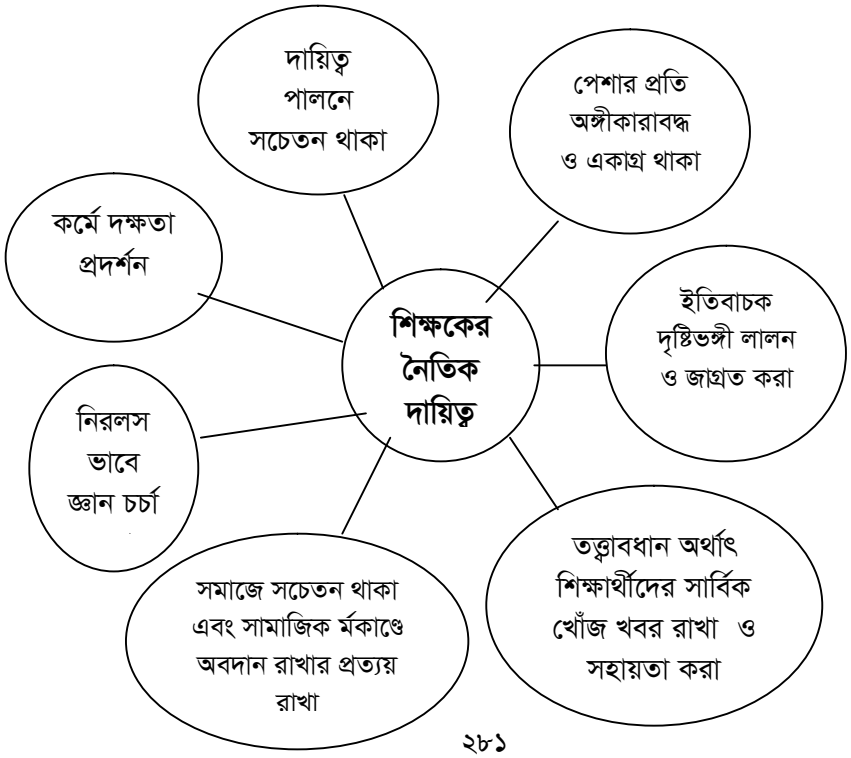

পর্ব-গ : শিক্ষকের আইনগত অধিকার

একজন শিক্ষক যখন আইনগত ও নৈতিক দায়িত্ব পালন করেন তখন তার বিনিময়ে তারও কিছু আইনগত ও নৈতিক অধিকার প্রাপ্য হয়। এ অধিকারগুলো তিনি পেতে পারেন তার কর্মস্থল থেকে। এ অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে চাকুরির সাধারণ সুবিধাবলি লাভ, নিয়মিত পদোন্নতি, পেশাগত উন্নয়নে জ্ঞান লাভের সুযোগ, আর্থিক সুবিধা, চাকুরির নিরাপত্তা, পেশাগত প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এগুলোকে নিচের ছকে সাজালে বিষয়টি আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

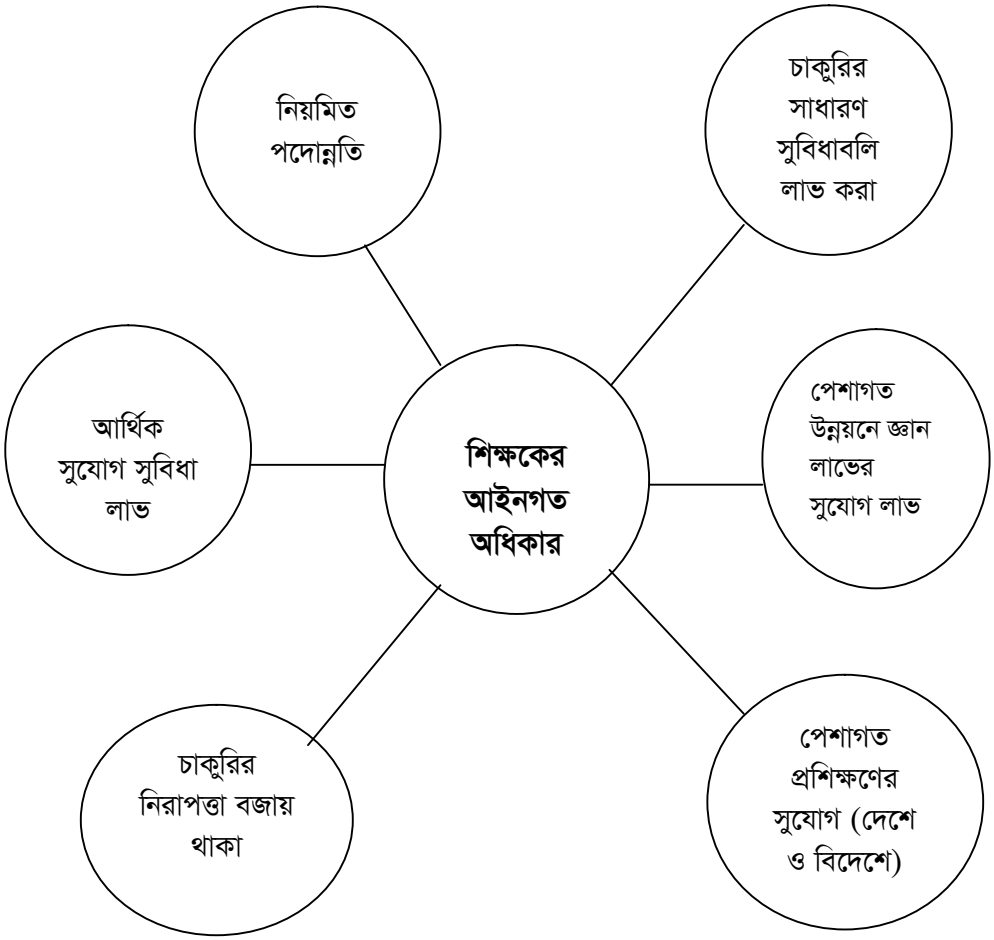

পর্ব-ঘ : শিক্ষকের নৈতিক অধিকার

একজন শিক্ষকের আইনগত অধিকারের পাশাপাশি কিছু নৈতিক অধিকারও রয়েছে। এ অধিকারগুলো তিনি পেতে পারেন তার প্রতিষ্ঠান থেকে, রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে। এ অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে পেশাগত দায়িত্ব পালনে অনুকূল পরিবেশ প্রাপ্তি, সামাজিক মর্যাদা প্রাপ্ত, মত প্রকাশের অধিকার, জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির অধিকার, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার ইত্যাদি। এ অধিকারগুলোকে আমরা নিম্নের ছকে সাজাতে পারি —

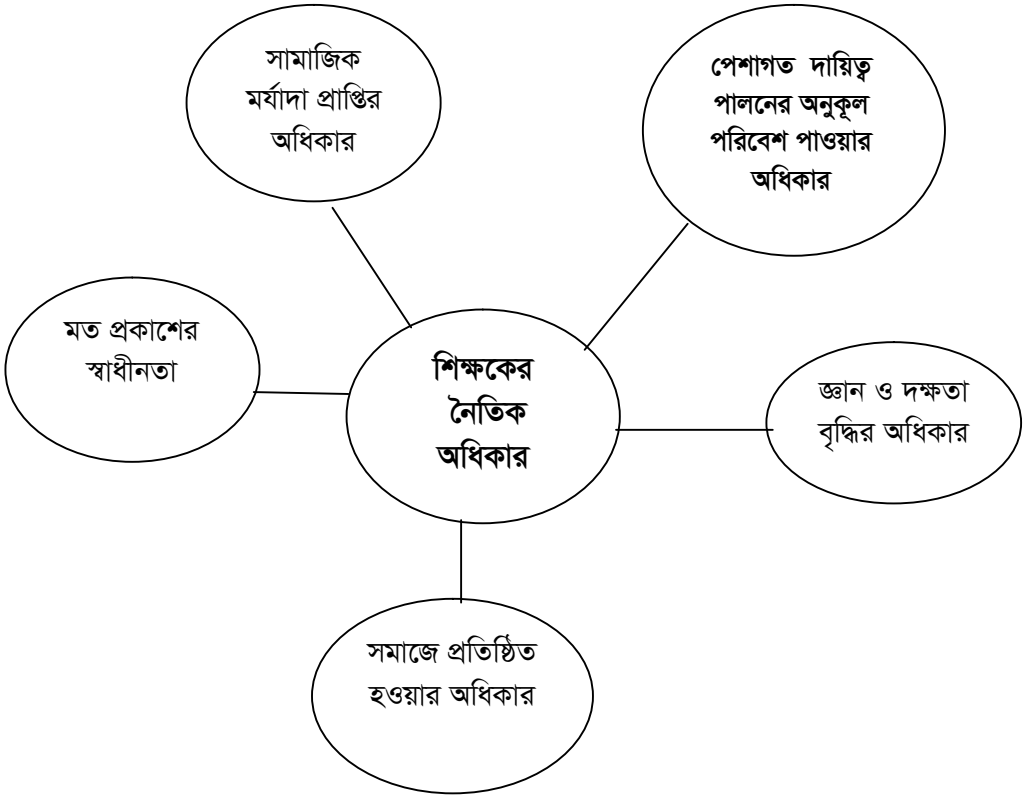

এবার আসুন আমরা শিক্ষকের নিম্নোক্ত অধিকারগুলোকে নিচের ছকে সাজানোর চেষ্টা করি—

- সংবাদপত্রে লেখালেখি
- শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা
- কর্মে দক্ষতা প্রদর্শন
- প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মেনে চলা
- প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা লাভ
- চাকুরির শর্তাবলি মেনে চলা
- পেশাগত প্রশিক্ষণ লাভ
- জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি

শিক্ষকের দায়িত্ব		শিক্ষকের অধিকার	
আইনগত	নৈতিক	আইনগত	নৈতিক

ইউনিট-৯ **অধিবেশন-৪**

মূল শিখনীয় বিষয়

শিক্ষকের আইনগত ও নৈতিক দায়িত্ব এবং অধিকার

যিনি শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করে শিখন শেখানো কার্যক্রম নিয়োজিত আছেন তিনিই শিক্ষক। এ পেশা গ্রহণ করাতে তাঁর উপর বেশ কিছু দায়িত্ব অর্পিত হয়। তাঁকে সে দায়িত্ব নিয়েই শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করে যেতে হবে। এ দায়িত্ব দু'ধরনের। একটি আইনগত ও অপরটি নৈতিক। এ দায়িত্বগুলো সম্বন্ধে তাকে সচেতন থাকতে হবে। এগুলো হল :

শিক্ষকের দায়িত্ব

শিক্ষকের আইনগত দায়িত্ব

ক) **দেশের সংবিধান মেনে চলা :** দেশ ও জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ও দেশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার যে বিধিবদ্ধ অনুসরণীয় আইনগত কাঠামো তাই হল সংবিধান। এ সংবিধানে একজন দায়িত্ববান নাগরিক, একজন পেশাদার ও কর্মচারী হিসেবে অনুসরণীয় ধারাগুলো মেনে চলা একজন শিক্ষকের দায়িত্ব। দেশের নাগরিক হিসেবে কেউ দেশের সংবিধানের বাইরে যেতে পারেন না।

খ) **চাকুরির শর্ত ও সাধারণ বিধিবিধান মেনে চলা :** একজন শিক্ষক তাঁর চাকুরির শর্তাবলি মেনে চলবেন, যেমন বিশেষ প্রয়োজনে ছুটি নিতে হলে প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদন করে ছুটি মঞ্জুর করে নিতে হয়, কিন্তু তিনি বৎসরে ২০ দিনের বেশি নৈমিত্তিক ছুটি পাবেন না। এটা তাকে মেনে চলতে হবে। তিনি যদি অননুমোদিত ভাবে অনুপস্থিত থাকেন তা হলে যে ক'দিন অনুপস্থিত থাকবেন সে ক'দিনের বেতন পাবেন না - এটা বিধান। অতএব একজন শিক্ষককে চাকুরিগত শর্তাবলি ও বিধিবিধান মেনে চলা তাঁর দায়িত্ব এবং তাঁর জন্য অপরিহার্য।

(গ) **প্রতিষ্ঠানের নিয়ম কানুন মেনে চলা :** প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান-এর নিজস্ব কিছু নিয়ম কানুন থাকে। এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানের নিয়ম কানুন ভিন্ন। প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও কার্যাবলি হিসেবে এ সব নিয়ম কানুন নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন একটি জুট মিলে শিফট অনুযায়ী রাতভর ডিউটি করতে হয়; কিন্তু একটি ব্যাংকে তেমন করতে হয় না। বিদ্যালয় একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করে গড়ে তোলার কাজে সকলে নিয়োজিত। এখানকার কার্যক্রম অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিচালনার নিজস্ব যে সমস্ত নিয়ম কানুন আছে তা মেনে চলা আইনগতভাবে শিক্ষকের দায়িত্ব। এ নিয়ম কানুনসমূহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি ও শিক্ষক পরিষদ থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

(ঘ) শৃংখলা বিধি মেনে চলাঃ চাকুরিগত ও বিদ্যালয় এর কর্মকাণ্ড পরিচালনা সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু শৃংখলা বিধি রয়েছে। সে সব মেনে চলা শিক্ষকের দায়িত্ব। যেমন- সময়মত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়া, সময়মত বিদ্যালয় ত্যাগ করা ইত্যাদি।

(ঙ) আচরণ বিধি মেনে চলা : শিক্ষক হিসেবে তাঁর মধ্যে শিক্ষকসূলভ আচরণ থাকতে হবে। আচরণিক দিক দিয়ে বেশ কিছু বিধিবিধান রয়েছে সে সব মেনে চলা শিক্ষকের দায়িত্ব। যেমন - প্রধান শিক্ষকের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, শিক্ষকগণ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সহযোগিতা প্রদর্শন ইত্যাদি।

(চ) শিক্ষাদান ও অর্পিত দায়িত্ব পালন : শিক্ষকের মূখ্য দায়িত্ব হল শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা। তাঁর পক্ষে এক্ষেত্রে যাবতীয় করণীয় পরিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করা। এ দায়িত্ব পালনে তিনি কখনও শিথিলতা প্রদর্শন করতে পারেন না। এ ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন আইনগত ভাবে ক্ষমার অযোগ্য।

শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন যেমন কঠিন তেমনি সময়সাপেক্ষ, এতদসত্ত্বেও শিক্ষক হিসেবে তাঁকে নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করতে হয়। যেমন-

* নিয়মিত শ্রেণি পাঠদান
* পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ
* শিক্ষার্থীর কৌতূহল সৃষ্টি
* সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন
* শিক্ষার্থীর উদ্ভাবনী মনোভাব সৃষ্টি
* মূল্যবোধ সৃষ্টি
* নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠাকরণ
* প্রগতিশীল চেতনা জাগ্রতকরণ
* শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাসকরণ
* প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জনে মনোরম পরিবেশ তৈরিকরণ
* শিক্ষার উন্নয়ন

শ্রেণিকক্ষের কার্যক্রম

শিক্ষাদান কার্যাবলির পাশাপাশি সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি সংক্রান্ত যখন যে দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হবে তাও সম্পন্ন করা তাঁর আইনগত দায়িত্ব। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত যে কোন অর্পিত দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হবে।

কোন কোন সময় বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড বহির্ভূত কিছু দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয় যেমন- জনসংখ্যা পরিসংখ্যানের কাজ, ভোটার তালিকা তৈরি করা, নির্বাচনের সময় দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি। এ ধরনের দায়িত্ব সাংবিধানিক অর্পিত দায়িত্ব। এসব দায়িত্বও তাঁকে পালন করতে হয়।

শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্ব

শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্ব

শিক্ষক যখন শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করেছেন তখন এ পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু দায়িত্ব নীতিগতভাবে তাঁর উপর বর্তায়। এ সকল নৈতিক দায়িত্ব তাকেই পালন করতে হয়। যেমন -

(ক) পেশার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ ও একাগ্র থাকা : শিক্ষককে তাঁর শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে। তিনি সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে তাঁর এ দায়িত্ব পালন করবেন। মনে প্রাণে এটাকে গ্রহণ করে নিয়ে তাঁর দায়িত্ব পালনে শিথিলতা আসলে ভবিষ্যত প্রজন্মের ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হবে সেটা জাতীয় ক্ষতি, অতএব এটা তিনি হতে দিবেন না। তাঁর ভিতর এ নৈতিক অঙ্গীকার থাকবে। অতএব তিনি একাগ্রভাবে তার দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) দায়িত্ব পালনে সচেতন থাকা : তিনি শিক্ষক অতএব সমাজ, জাতি, অভিভাবক ও তার প্রিয় শিক্ষার্থী তাঁর নিকট কী আশা করে, তাঁর শিক্ষার্থীর প্রতি তাঁর দায়িত্বটা কী - এসব উপলব্ধি তাঁর ভিতর থাকতে হবে। অতএব দায়িত্ব পালন করে তাঁর কর্মের উদ্দেশ্য সাধন ক'রে লক্ষ্যে পৌছার জন্য সচেতন থাকা তাঁর নৈতিক দায়িত্ব।

(গ) কর্মে দক্ষতা প্রদর্শন : শিক্ষক তাঁর শিক্ষকতা পেশায় তাঁর দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য দক্ষতা অর্জন করবেন এবং দক্ষতা প্রদর্শন করবেন; অদক্ষ শিক্ষকের নিকট থেকে

শিক্ষার্থীরা এবং প্রতিষ্ঠান যথাযথ সেবা পায় না, আশানুরূপ উপকারও পাবে না। অতএব দক্ষতা অর্জন এবং তার প্রয়োগ শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্ব।

(ঘ) নিরলস জ্ঞান চর্চা : কথায় আছে A teacher is a life long student. শিক্ষার শেষ নেই আর শিক্ষকের জ্ঞান অর্জন ও দক্ষতা অর্জন কখনও শেষ হয়ে যায় না। অতএব শিক্ষককে নিরলসভাবে জ্ঞান চর্চা করতেই হবে। যে শিক্ষক জ্ঞান চর্চা করেন নিঃসন্দেহে তিনি দক্ষ ও অভিজ্ঞ হয়ে উঠেন এবং তাঁর সাহচর্যে তাঁর শিক্ষার্থীরা অজান্তেই অনেক কিছু তাঁর নিকট থেকে শিখে থাকে। তিনি নিজেও উপকৃত হন। জ্ঞান দান ও জ্ঞান অর্জন যুগপৎ ভাবে অবস্থান করে। অতএব শিক্ষকের জন্য জ্ঞান চর্চা করার কোন বিকল্প নেই। এটা তাঁর একটি নৈতিক দায়িত্ব।

(ঙ) ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লালন ও জাগ্রত করা : শিক্ষক তাঁর শিক্ষকতা পেশাকে বড় করে দেখবেন। অন্য যে কোন পেশার চেয়ে শিক্ষকতা পেশা একটি আদর্শ, মর্যাদাবান ও মহৎ পেশা হিসেবে এটাকে মনে প্রাণে আঁকড়ে ধরবেন। 'শিক্ষক' অর্থই 'আদর্শ ব্যক্তি' অতএব সকল পেশার ঊর্ধ্বে এ পেশা। সে হিসেবে এ পেশার মান ও মর্যাদা রক্ষা করে চলা শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্ব।

(চ) সমাজে সচেতন থাকা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখার প্রত্যয় রাখা: শিক্ষক সমাজের একজন ব্যক্তি। আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে তিনি পরিচিত। তাঁর এই মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার জন্য তিনি সচেতন থাকবেন। অন্য দিকে তিনি সমাজের মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবে সমাজ পরিচালনায় ভূমিকা রাখবেন। সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখবেন। অন্যায় ও অনাদর্শ কাজ থেকে সম্ভব মত অন্যকে বিরত রাখার চেষ্টা করা তাঁর যেমন নৈতিক দায়িত্ব তেমনি সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করাও তার নৈতিক দায়িত্ব। তাছাড়া একজন শিক্ষক সমাজ সংস্কারক এবং সমাজ শাসক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাঁর দায়িত্বসমূহ হল :

* **সমাজ সংস্কারক হিসাবে**
* নিরক্ষরতা দূরীকরণ
* কুসংস্কার দূরীকরণ
* স্বাস্থ্য সচেতনতা জাগ্রত করা
* পরিবেশ সচেতনতা জাগ্রতকরণ
* পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
* সমাজের উন্নয়ন সাধন

মূল্যায়ন

১. শিক্ষকের আইনগত দায়িত্বসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২. শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্বসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৩. শিক্ষকের আইনগত অধিকার বলতে কি বোঝেন? ব্যাখ্যা করুন।

৪. শিক্ষকের নৈতিক অধিকারসমূহ উল্লেখ করুন এবং আপনার মতামত দিন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ঘ

শিক্ষকের দায়িত্ব		শিক্ষকের অধিকার	
আইনগত	**নৈতিক**	**আইনগত**	**নৈতিক**
• প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মেনে চলা	• শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা	• প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা লাভ	• সংবাদপত্রে লেখালেখি
• চাকুরির শর্তাবলি মেনে চলা	• কর্মে দক্ষতা প্রদর্শন	• পেশাগত প্রশিক্ষণ লাভ	• জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি

ইউনিট -৯ **অধিবেশন- ৫**

একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য

ভূমিকা

শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হচ্ছে বিদ্যালয়। তাছাড়া বিদ্যালয় হল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের এমনভাবে উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করা যাতে তারা পরবর্তী জীবনে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ার উপযুক্ত হয়ে বেড়ে উঠে। তার জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে যেমন সে তার নিজের জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন করতে পারে। অপরদিকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। একটি বিদ্যালয় কতটুকু উন্নত তা বুঝা যাবে সেই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার উপর এবং এর চাবিকাঠি থাকে প্রধান শিক্ষকের হাতে। তাই বলা যায় একটি উন্নত বিদ্যালয় একজন দক্ষ প্রধান শিক্ষকের প্রতীক। যেখানে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠদান করা হয়ে থাকে। এ অধিবেশনে আমরা একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।

একটি বিদ্যালয়

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লেখ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ

বিদ্যালয় হতে পারে অনেক রকমের। আমরা যদি শিক্ষার ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে একেক সময়ে একক রকম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিদ্যালয় দেখতে পাবো। প্রাচীন যুগের বিদ্যালয় ছিল তপোবনে, গুরুগৃহে। সেখানে শিক্ষা উপকরণ বলতে ছিল গুরু স্বয়ং এবং তার তপস্যা গৃহ। মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামলে বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল মসজিদকে কেন্দ্র করে। মসজিদের পাশেই থাকতো মক্তব। এসব মক্তবে শিক্ষার আধুনিক উপকরণসমূহ ছিল না। প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে বিদ্যালয়ের ফলাফল বলতেও সংগঠিত কিছু ছিল না। আধুনিককালে বিদ্যালয় বলতেই আমারা আসবাব ও শিক্ষা উপকরণ সুসজ্জিত বহু শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মুখরিত বিদ্যার নিকেতনকে বুঝি। সেখানে নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিকল্পিত শিক্ষাক্রম কাঠামো এবং শিখনফল মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে। তাহলে আসুন শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার আমরা নিম্নের ছকে প্রাচীন ও বর্তমানকালের বিদ্যালয়ের তিনটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করি।

বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য (প্রাচীনকাল)	বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য (আধুনিককাল)
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.

পর্ব-খ : একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য

একটি আদর্শ বিদ্যালয় কাকে বলা যায়, এক কথায় বলা হয় যে বিদ্যালয়ের ফলাফল ভাল, এটা কী পুরাপুরি ঠিক? আসলে ফলাফল হল পরিমাপের একটি তুলনামূলক একক। এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, পরীক্ষার ফলাফল কী সবসময় বিদ্যালয়ের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটায়? যারা পাশ করে বের হয় তারা কী সমাজের চাহিদা মেটাতে সক্ষম বা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত? আবার তারা হতে পারে চাকরি পাওয়ার অনুপযুক্ত, অতিমাত্রায় একাডেমিক, শহরের বাইরে কাজ করতে অনিচ্ছুক, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে অক্ষম বা বিদেশে যাবার প্রবণতাসম্পন্ন। সুতরাং বিদ্যালয়ের সফলতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এসব বাহ্যিক বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে। আন্তর্জাতিকভাবে একটি আদর্শ বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো উপস্থিত থাকতে হবে।

- বিদ্যালয়ের সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষকবৃন্দের বিদ্যালয় সম্পর্কে উচ্চাকাঙ্খা
- প্রধান শিক্ষকের সঠিক নেতৃত্ব
- শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে সময় জ্ঞান
- বিদ্যালয়ে নিরাপদ, নিয়মতান্ত্রিক, বন্ধুবৎসল এবং আকর্ষণীয় পরিবেশ।
- বিদ্যালয়ে জন-অংশগ্রহণ বিদ্যমান

তাছাড়া একটি বিদ্যালয় আরও কিছু প্রয়োজনীয় উপাদান নিয়ে গড়ে উঠে। এ বিষয়ে মূল শিখনীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এবার চলুন, নিম্নের ছকে আদর্শ বিদ্যালয়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখার চেষ্টা করি।

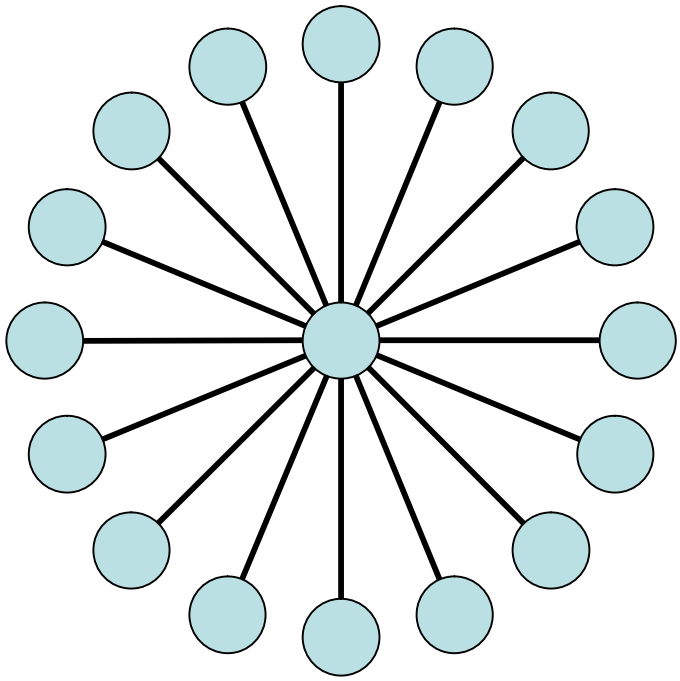

একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য

পর্ব-গঃ আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

আধুনিক জগতের নতুন জ্ঞান ও কলাকৌশল আয়ত্তে আনার সুযোগ শিক্ষার্থী যখনই পাবে যখন শিক্ষক সেই জ্ঞান ও কলাকৌশলে সমৃদ্ধ হবেন এবং যথাসময়ে যথাযথভাবে শিক্ষার্থীর নিকট পৌছে দেবেন এবং সেটা হবে বিদ্যালয় পরিবেশে। বিদ্যালয় হল একটি সামাজিক এবং মানবসম্পদ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান। মানবকে সম্পদে পরিণত করার মত একটি মহান ব্রত এই বিদ্যালয় নামক কারখানাটি। বিদ্যালয়ের লক্ষ্যে পৌছাতে হলে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। এই কর্মসমূহ সম্পাদনে যারা নিবেদিত প্রাণ তারা হলেন ঐ প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষকমণ্ডলি।

প্রধান শিক্ষক একাধারে স্কুলের প্রধান কার্যনির্বাহী, অন্যদিকে স্কুল ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যবস্থাপনা কমিটিতে পদাধিকার বলে সদস্য সচিব। বিদ্যালয় উন্নয়নের সকল

কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে প্রধান শিক্ষকদের অগ্রণী ভূমিকা বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রধান শিক্ষক স্কুলের প্রশাসনিক কার্যাবলি, একাডেমিক কার্যাবলি, আর্থিক কার্যাবলি, উন্নয়নমূলক কার্যাবলি, প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা বিধান, লেখাপড়ার মান নিশ্চিতকরণ ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন এবং বিনোদনমূলক কর্মকান্ড ইত্যাদি বিষয়গুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালনের জন্য মূলত মূল ভূমিকা পালন করে থাকেন।

একাডেমিক প্রধান হিসাবে প্রধান শিক্ষক স্কুলের দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনা, ছাত্র ভর্তি, শ্রেণি প্রমোশন, বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় প্রার্থী নির্বাচন, বিদ্যালয়ের সময়সূচি প্রণয়ন ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করেন।

এবার আসুন বন্ধুরা, প্রধান শিক্ষকের কয়েকটি কার্যাবলি চিহ্নিত করি।

১.

২.

৩.

৪.

৫.

ইউনিট- ৯ **অধিবেশন -৫**

মূল শিখনীয় বিষয়

একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য

শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হচ্ছে বিদ্যালয়। তাছাড়া বিদ্যালয় হল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের এমনভাবে উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করা যাতে তারা পরবর্তী জীবনে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ার উপযুক্ত হয়ে বেড়ে উঠে। তার জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে যেমন সে তার নিজের জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন করতে পারে। অপরদিকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অবদান রাখতে পারে। একটি বিদ্যালয় কতটুকু উন্নত তা বুঝা যাবে সেই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার উপর এবং এর চাবিকাঠি থাকে প্রধান শিক্ষকের হাতে। তাই বলা যায় একটি উন্নত বিদ্যালয় একজন দক্ষ প্রধান শিক্ষকের প্রতীক। যেখানে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠদান করা হয়ে থাকে।

একটি আদর্শ বিদ্যালয় কাকে বলা যায়, এক কথায় বলা হয় যে বিদ্যালয়ের ফলাফল ভাল, এটা কী পুরাপুরি ঠিক? আসলে ফলাফল হল পরিমাপের একটি তুলনামূলক একক। এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, পরীক্ষার ফলাফল কী সবসময় বিদ্যালয়ের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটায়? যারা পাশ করে বের হয় তারা কী সমাজের চাহিদা মেটাতে সক্ষম বা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত? তারা হতে পারে চাকরি পাওয়ার অনুপযুক্ত, অতিমাত্রাই একাডেমিক, শহরের বাইরে কাজ করতে অনিচ্ছুক, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে অক্ষম বা বিদেশে যাবার প্রবণতা সম্পন্ন। সুতরাং বিদ্যালয়ের সফলতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এসব বাহ্যিক বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে। আন্তর্জাতিকভাবে একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত উপাদানগুলো উপস্থিত থাকতে হবে।

- বিদ্যালয়ের সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষকবৃন্দের বিদ্যালয় সম্পর্কে উচ্চাকাঙ্খা
- প্রধান শিক্ষকের সঠিক নেতৃত্ব
- শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে সময় জ্ঞান
- বিদ্যালয়ে নিরাপদ, নিয়মতান্ত্রিক, বন্ধুবৎসল এবং আকর্ষণীয় পরিবেশ।
- বিদ্যালয়ে জন-অংশগ্রহণ বিদ্যমান

তাছাড়া একটি বিদ্যালয় আরও কিছু প্রয়োজনীয় উপাদান নিয়ে গড়ে উঠে। যেমন-

১। শিক্ষার্থী

২। প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকবৃন্দ
৩। বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো
৪। বিদ্যালয়ের অবস্থান
৫। বিদ্যালয়ের মাঠ
৬। বিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী
৭। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি
৮। গ্রন্থাগার
৯। বিজ্ঞানাগার
১০। ব্যায়ামাগার
১১। অডিটরিয়াম
১২। টয়লেট সুবিধা
১৩। পানীয় জলের সুবিধা
১৪। কম্পিউটার সুবিধা।

উপরোক্ত উপাদানগুলোর সমন্বয়ে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তবে একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের জন্য আরও কিছু উপাদান দরকার। একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের মান নির্ভর করে বিদ্যালয়ের সাংবাৎসরিক কার্যক্রমের উপর। একটি বিদ্যালয় যদি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে এবং কাঙ্খিত ফললাভ করতে পারে তবেই তাকে আদর্শ বিদ্যালয় বলা যেতে পারে।

আদর্শ বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য

একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য নিম্নে প্রদত্ত হল :

আদর্শ বিদ্যালয়

১। **শিক্ষার্থী :** বিদ্যালয়ের প্রাণ হল তার কোমলমতি শিক্ষার্থী। প্রত্যেক শ্রেণিতে প্রত্যেক শাখায় পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী থাকলে তারা বিদ্যালয়ের নিয়ম মেনে চলবে, শ্রেণির শৃঙ্খলা বজায় রাখবে এবং বিদ্যালয়ের নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান করে বিদ্যালয়ে আসবে।

২। **প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ :** বিদ্যালয়ের চালিকাশক্তি হল প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক অবশ্যই একজন দক্ষ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও উচ্চশিক্ষিত হওয়া দরকার। তাছাড়া সহকারী প্রধান শিক্ষকও তেমন সুদক্ষ, কর্মঠ হওয়া দরকার। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক সকলেই পেশাগত বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও নিজ বিষয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া দরকার। যোগ্যতাসম্পন্ন নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক না থাকলে বিদ্যালয়ের পড়াশোনার মান ভাল হবে না, ফলশ্রুতিতে বিদ্যালয়ের ফলাফলেও হবে বিপর্জয়। তাই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের বিকল্প নাই।

৩। **ভৌত অবকাঠামো :** একটি বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো যেমন প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের জন্য বসার কক্ষ, অফিস কক্ষ, ছেলে ও মেয়েদের জন্য কমন রুম, পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, নামাজ ঘর, প্রাথমিক চিকিৎসা কক্ষ ও টয়লেট সুবিধাদি থাকা আবশ্যক।

৪। **সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি ঃ** শিক্ষার্থীদের রুচি ও মেধা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির ব্যবস্থা থাকবে। যেমন- খেলাধুলা, গান, আবৃত্তি, নাটক, অভিনয়, বিতর্ক, কুইজ প্রতিযোগিতা, স্কাউট ও গার্লস গাইড কার্যক্রমে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশসমূহ বাস্তবায়ন, বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ সহ বিভিন্ন দিবস ও কর্মসূচি পালন, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি।

বাৎসরিক ক্রীড়া

মিলাদ মাহফিল

ছবিঃ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম

বিদ্যালয়ে পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম

বর্ষশেষ অনুষ্ঠান

বার্ষিক ক্রীড়া (হাউজ প্রথা)

৫। **অডিটরিয়াম :** বিদ্যালয়ে অডিটরিয়ামের খুবই প্রয়োজন, যেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে। প্রয়োজনে শিক্ষার্থী বিভিন্ন কার্যক্রমের প্র্যাকটিস করতে পারবে।

৬। **জিমনেশিয়াম :** সুস্থ দেহ সুস্থ মন। তাই শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি ব্যায়াম ও শরীর সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান দিবার জন্য জিমনেশিয়ামের অবশ্যই প্রয়োজন।

৭। **ল্যাবরেটরী ও লাইব্রেরী :** শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরীর প্রয়োজন অনস্বীকার্য, লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বই থাকবে এবং শিক্ষার্থীরা সেটা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে। তাছাড়া বিজ্ঞানের বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্লাশ ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন কাজ বিজ্ঞানাগারেই করা দরকার। একটি ভাল ল্যাবরেটরী প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে থাকা দরকার।

৮। **খেলার মাঠ ও পুকুর :** বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা ও দৈনন্দিন সমাবেশের জন্য মাঠ থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া পুকুর থাকলে কৃষি শিক্ষার বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারিক ক্লাশেও কাজে লাগে। মাঠ ও পুকুরের চারিপাশে গাছ লাগালে পরিবেশ ভাল থাকে, সাথে সাথে তা থেকে ফল, ছায়া ও কাঠ পাওয়া যায় যা থেকে বিদ্যালয়ের আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায়।

৯। **বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি (SMC) :** এই কমিটির দায়িত্ব হল স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য সকল প্রকার ভৌত সুবিধা এবং পরিবেশ উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে যথাযথ নিয়োগ বিধির আলোকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সকল প্রকার চাপ ও প্রভাব মুক্ত হয়ে দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ করা যাতে করে বিদ্যালয়টি ভালভাবে চলতে পারে।

১০। **সমাবেশ ও তদারকী :** দৈনিক সমাবেশ আদর্শ বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ অংশ। প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং শ্রেণি শিক্ষক দৈনিক সমাবেশ ও ক্লাশ তদারকী করবেন।

১১। **সময় তালিকা প্রণয়ন ও অনুসরণ :** সময় তালিকা প্রণয়ন আদর্শ বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ কাজ এবং সেটা অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা, পাঠ-পরিকল্পনা ইত্যাদিও বছরের প্রথমেই করা দরকার এবং সুষ্ঠুভাবে তা সারা বছর মেনে চলা উচিত। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১২। **প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষকবৃন্দের বিদ্যালয় সম্পর্কে উচ্চাশা :** প্রধান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দকে সাথে নিয়ে নিয়মিত শিক্ষাক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন এবং প্রতিটি শ্রেণিতে ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধান করার চেষ্টা করবেন। প্রয়োজনে বিষয় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। শিক্ষক, কর্মচারী সকলের বিদ্যালয় সম্পর্কে একটি উচ্চাশা থাকবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করবে।

১৩। **বিদ্যালয়ে নিরাপদ, নিয়মতান্ত্রিক, বন্ধুবৎসল এবং আকর্ষণীয় পরিবেশ :** বিদ্যালয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং সকল কর্মচারীদের একে অপরের প্রতি বন্ধু বৎসল হওয়া প্রয়োজন। আনন্দোচ্ছল পরিবেশ সর্বদা যেন বিদ্যালয়ে বিরাজ করতে পারে সেরকম নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের পরিবেশ হবে নিরাপদ এবং আকর্ষণীয়।

১৪। **বিদ্যালয়ে জন-অংশায়ন :** বিদ্যালয় যে এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকার লোকজন, অভিভাবক, শিক্ষাবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, কৃষক, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য অর্থাৎ সর্বস্তরের জনগণ যার যার অবস্থানে থেকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সহযোগিতা করবেন। মোট কথা বিদ্যালয়ে সকল কার্যক্রমে কমিউনিটির সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন।

১৫। **মাসিক সভা ও জবাবদিহিতা:** বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রতি মাসে শিক্ষকদের সাথে বিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা নিয়ে মত বিনিময় করবেন এবং প্রয়োজনে জবাবদিহি করবেন।

১৬। **টয়লেট সুবিধাদি :** বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত টয়লেট সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকবে এবং পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে তদারকী করতে হবে।

১৭। **খাবার পানির ব্যবস্থা :** বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং সব সময় যেন প্রয়োজন মত পানি সরবরাহ করা হয় সে ব্যাপারেও খেয়াল করা দরকার।

১৮। **বিদ্যালয়ের সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :** আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ভৌত সম্পদ, মানব সম্পদ এবং অর্থ সম্পদ। এই সকল সম্পদের প্রাপ্যতার অভাব বা আধিক্য কোনটাই সফলতার মাপকাঠি নয়। একটি পরিকল্পিত, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক

ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার যে বিদ্যালয় নিশ্চিত করতে পারে সেই বিদ্যালয়ই আদর্শ বিদ্যালয়।

১৯। **নথি ব্যবস্থাপনা :** বিদ্যালয়ের সকল নথি হাল নাগাদ করে রাখা এবং যখন যা চাওয়া হয় তখন যাতে সহজে পাওয়া যায় সে হিসাবে সাজিয়ে রাখতে হবে।

২০। **শ্রেণি সংগঠন ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনা :** এই বিষয়টি শ্রেণি পাঠদানের জন্য অত্যন্ত জরুরি। প্রধান শিক্ষক বা তাঁর প্রতিনিধি সবসময় তা তদারকী করবেন।

২১। **অভিভাবক দিবস :** বৎসরের একটা নির্দিষ্ট দিনে বা যখন স্কুল কর্তৃপক্ষ মনে করে তখন অভিভাবকদের ডেকে স্কুল সম্বন্ধে বা শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারেন।

২২। **অন্যান্য বিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্ক :** একটি আদর্শ বিদ্যালয় সব সময়ই আশে-পাশের অন্যান্য বিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখবে।

২৩। **সভা ব্যবস্থাপনা :** বিদ্যালয়ের কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হলে অবশ্যই সভা আহ্বান করা প্রয়োজন।

২৪। **অফিস ব্যবস্থাপনা :** আদর্শ বিদ্যালয়ের অফিস ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণমূলক তথ্যের উদ্দেশ্যের যথাযথ নথি পত্র এবং দক্ষ পরিচালনার নীতি যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হয়।

২৫। **ফলাফল :** আদর্শ বিদ্যালয় তথা যে কোন বিদ্যালয়ের সুনাম নির্ভর করে সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ফলাফলের উপর। প্রাথমিক, জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ও অন্যান্য সংস্থার বৃত্তি পরীক্ষা এবং এস.এস.সি. পরীক্ষার ফলাফল যেন ভাল হয় সেদিকে সকলের লক্ষ্য রাখা দরকার।

একটি আদর্শ বিদ্যালয় হল সমাজ উন্নয়নের হাতিয়ার। বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের জীবনযাত্রা, শিক্ষা, নিরাপত্তা এবং পরিবেশের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। একটি আদর্শ বিদ্যালয় হল একটি আলোকিত সমাজ ব্যবস্থা।

(খ) আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য :

প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব

আধুনিক জগতের নতুন জ্ঞান ও কলাকৌশল আয়ত্তে আনার সুযোগ শিক্ষার্থী যখনই পাবে যখন শিক্ষক সেই জ্ঞান ও কলাকৌশলে সমৃদ্ধ হবেন এবং যথাসময়ে যথাযথভাবে শিক্ষার্থীর নিকট পৌছে দেবেন এবং সেটা হবে বিদ্যালয় পরিবেশে। বিদ্যালয় হল একটি সামাজিক এবং মানবসম্পদ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান। মানবকে সম্পদে পরিণত করার মত একটি মহান ব্রত এই বিদ্যালয় নামক কারখানাটি। বিদ্যালয়ের লক্ষ্যে পৌছাতে হলে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। এই কর্মসমূহ সম্পাদনে যারা নিবেদিত প্রাণ তারা হলেন ঐ প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকমণ্ডলী।

প্রধান শিক্ষক একাধারে স্কুলের প্রধান কার্যনির্বাহী, অন্যদিকে স্কুল ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যবস্থাপনা কমিটিতে পদাধিকার বলে সদস্য সচিব। বিদ্যালয় উন্নয়নের সকল কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে প্রধান শিক্ষকদের ভাল সম্পর্ক বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রধান শিক্ষক স্কুলের প্রশাসনিক কার্যাবলি, একাডেমিক কার্যাবলি, আর্থিক কার্যাবলি, উন্নয়নমূলক কার্যাবলি, প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা বিধান, লেখাপড়ার মান নিশ্চিতকরণ ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন এবং বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি বিষয়গুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করবেন।

একাডেমিক প্রধান হিসাবে প্রধান **শিক্ষক** স্কুলের দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনায়, ছাত্র ভর্তি, শ্রেণি প্রমোশন, বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় প্রার্থী নির্বাচন, বিদ্যালয়ের সময়সূচি প্রণয়ন ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করেন।

বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য প্রধান শিক্ষক ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় পাঠদানের ক্ষেত্রে সময়োপযোগী, কার্যকর ও আধুনিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি প্রণয়ন এবং অন্যান্য শিক্ষকদেরকে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের ব্যাপারে দিক নিদের্শনা প্রদান করবেন। প্রধান শিক্ষক নিয়মিত পাঠদান, শিক্ষার্থী উপস্থিতি, পাঠ-পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে তত্ত্বাবধান করবেন এবং প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দের সাথে আলোচনায় মিলিত হবেন, আলোচনায় বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম উন্নয়নে আরো কী কী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন সে লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে দুর্বল ছাত্রদের শনাক্ত করে তাদের প্রতি আরো যত্নবান হবেন। ফলে দুর্বল শিক্ষার্থীরাও ভাল ফলাফল করতে পারবে।

প্রধান শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে ও দৈনিক অষ্টম ও দশম শ্রেণিতে ২টি ক্লাশ নিতে পারেন। প্রতিদিন অন্ততঃ দুইবার শ্রেণিকক্ষ তত্ত্বাবধান করতে পারেন। বার্ষিক পরিকল্পনা মাফিক কার্যাবলি অগ্রসর হচ্ছে কিনা তার খোঁজ খবর নেন। দায়িত্ব প্রাপ্ত সকল শিক্ষকের কাজ তদারকী করেন। সময়মত সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদন করায় অন্তত ধন্যবাদ জানিয়ে পুরস্কৃত করেন, আর যারা অসমর্থ হয় তাদেরকে তিরস্কার না করে সংশোধনের সুযোগ দেন এবং সুবচনে যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। এভাবেই ক্রমাগত বিদ্যালয়ের উন্নয়ন হতে পারে।

একজন প্রধান শিক্ষক হবেন চমৎকার কণ্ঠস্বরের অধিকারী, প্রত্যুৎপন্নমতি, পরমত সহিষ্ণু এবং সকলকে নিয়ে কাজ করার মানসিকতা সম্পন্ন। তাছাড়া নিরলস কর্মস্পৃহা ও নিরপেক্ষভাবে

কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার মানসিকতা ও প্রতিবেশী বিদ্যালয়গুলোর সাথে থাকবে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক।

প্রধান শিক্ষক হবেন বিদ্যালয়ের কোন দুর্যোগ মুহূর্তে কোন ব্যর্থতার বোঝা কাধে নেয়ার মত ব্যক্তিত্ব, দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন ও নেতৃত্বের পরিচালক। উপরোক্ত দায়িত্বাবলির কথা মাথায় রেখেই একজন প্রধান শিক্ষক তার বিদ্যালয়কে সফল পরিচালনায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করতে পারেন।

মূল্যায়ন

১. বিদ্যালয় কী? একটি বিদ্যালয়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি লিখুন।

২. একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী ? বর্ণনা করুন।

৩. আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে লিখুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ক

বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য (প্রাচীনকাল)	বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য (আধুনিককাল)
১. গুরুগৃহ	১. শিক্ষাদানের জন্যই নির্মিত গৃহ-বিদ্যালয়।
২. অনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম	২. সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম।
৩. অসংগঠিত মূল্যায়ন	৩. সুসংগঠিত মূল্যায়ন ব্যবস্থা।

পর্ব-খ

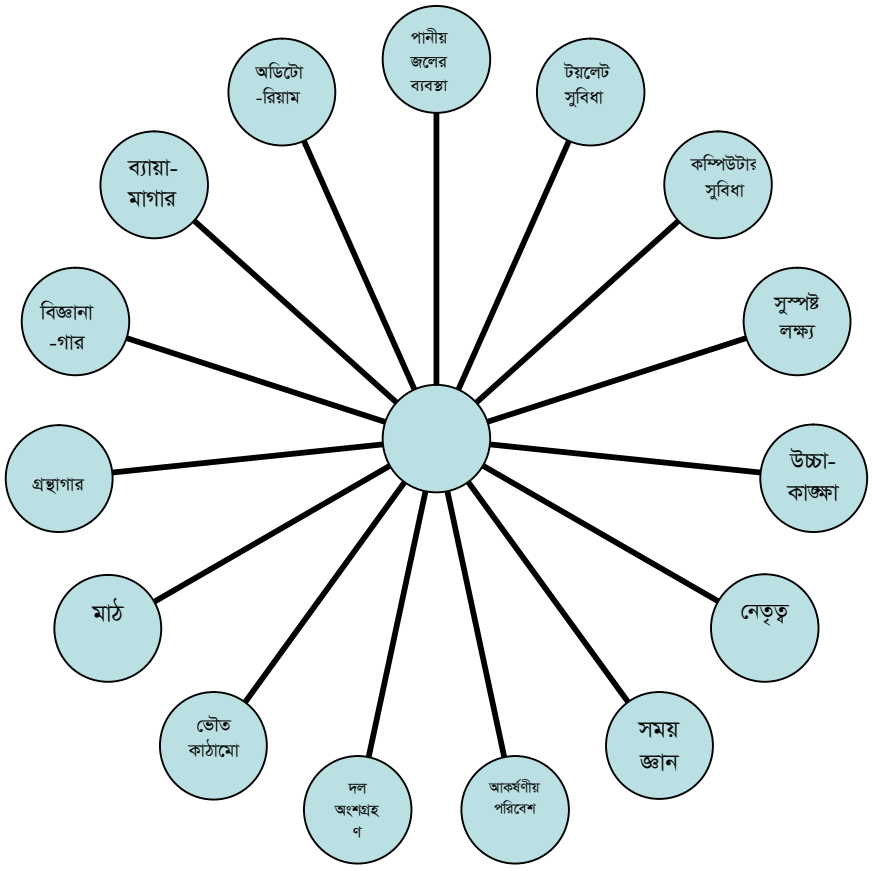

পর্ব-গ

১. প্রশাসনিক কার্যাবলি
২. একাডেমিক কার্যাবলি
৩. আর্থিক কার্যাবলি
৪. উন্নয়নমূলক কার্যাবলি
৫. বিনোদনমূলক কার্যাবলি